স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

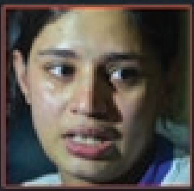

বিপন্ন হিন্দু নারী
— পৃঃ ১৪

সন্ত্রাসবাদের রাজনীতি না রাজনীতির সন্ত্রাসবাদ
— পৃঃ ২৯

৬৭ বর্ষ, ৫৩ সংখ্যা ।। ৩১ আগস্ট ২০১৫ ।। ১৩ ভাদ্র - ১৪২২ ।। website : www.eswastika.com

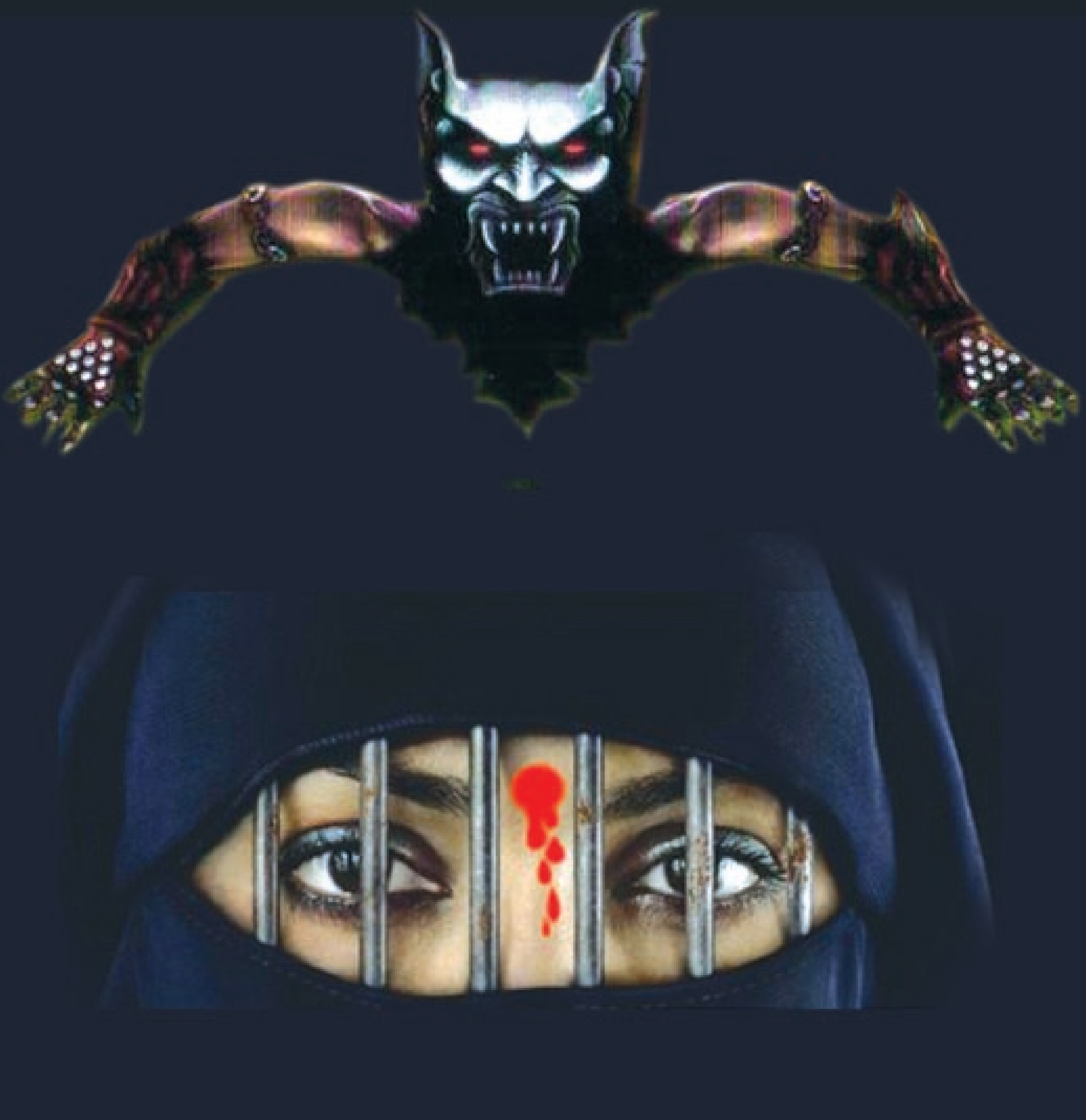

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ৫৩ সংখ্যা, ১৩ ভাদ্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

৩১ আগস্ট - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সি পি এমের রোপণ করা বিষবৃক্ষের বিষফল এখন ফলছে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : প্রেসিডেন্সিতে 'ব্রেসিয়ার বিপ্লব', পড়ুয়াদের দোষ নয় ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

গরিবি হঠাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি ▯ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ▯ ১২

বিপন্ন হিন্দু নারী ▯ অনসূয়া চন্দ্র ▯ ১৪

বিধর্মী আগ্রাসনের শিকার হিন্দু নারী ▯ রিনি রায় ▯ ১৬

বহুরূপেন সংস্থিতা ▯ মেঘদূত ভুঁই ▯ ২১

কিশোরী কন্যারূপে দেবী দুর্গার আত্মপ্রকাশ ▯ রূপশ্রী দত্ত ▯ ২৩

সন্ত্রাসের ছায়া পূর্ব দিগন্ত পর্যন্ত প্রলম্বিত ▯ সুবীর ভৌমিক ▯ ২৭

সন্ত্রাসবাদের রাজনীতি না রাজনীতির সন্ত্রাসবাদ ▯ ভাস্কর ভট্টাচার্য ▯ ২৯

শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ফের মুখ পুড়ল রাজাপক্ষের ▯ ৩১

আইন কী বলে এবং যা হওয়া উচিত ▯ দেবাংশু ঘোড়ই ▯ ৩২

ভারতের স্বাধীনতা ও উদ্বাস্তু সমস্যা ▯ সুকুমার সিকদার ▯ ৩৮

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯ অন্যরকম : ৩৩ ▯ সুস্বাস্থ্য: ৩৫ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭▯ খেলা : ৩৯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ চিত্রকথা : ৪১ ▯ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বাঘা যতীন— আত্মনিবেদনের শতবর্ষ

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরিচিত হয়েছিলেন বাঘ মেরে, বাঘা যতীন নামে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বাঘা যতীন-এর মুখঃনিঃসৃত 'আমরা মরব, দেশ জাগবে'-র মতো বাণীর সার্থক প্রতিফলন খুব কমই দেখা গিয়েছে। ১৯১৫ সালে বুড়িবালামের তীরে সেই ঐতিহাসিক সংগ্রামের শহীদ বাঘা যতীন-এর আত্মবলিদানের শতবর্ষ পূর্তির মাহেন্দ্রক্ষণ এবছরই। সেই উপলক্ষে আমাদের বিশেষ সংখ্যা। লিখেছেন— চন্দ্রমৌলী উপাধ্যায়, অভিরূপ নাগচৌধুরী প্রমুখ। থাকবে কিছু স্মৃতিকথা, সংশ্লিষ্ট তথ্য ও ছবি। সংরক্ষণযোগ্য সংখ্যা। সত্বর কপি বুক করুন।

দাম একই থাকছে — দশ টাকা।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অপপ্রচারের রাজনীতি

সংস্কৃত শাস্ত্রে একটি প্রবাদ রহিয়াছে 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি'। কথাটির অর্থ—ভালো কাজে বহু বাধা রহিয়াছে। ক্ষমতার আসনে বসিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছেন। যে বিষয়গুলি লইয়া বেশ কয়েকদিন সংসদ অচল হইয়া রহিল তাহার উৎস কিন্তু নিতান্তই শূন্য, ফাঁপা। ব্যাপম কেলেঙ্কারি লইয়া সংসদে কয়েকদিন হইচই হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের বিরুদ্ধে সংসদে ও সংবাদমাধ্যমে বিরূপ সমালোচনা হইয়াছে এবং তাঁহার পদত্যাগের দাবি তুলিয়া বিরোধীদল প্রবল আন্দোলন করিয়াছে। কিন্তু তবুও মধ্যপ্রদেশে পুরভোটে বিজেপি তুমুল ভাবে জিতিয়া আসিয়াছে। মধ্যপ্রদেশের মানুষ কী তবে ব্যাপম কেলেঙ্কারিকে সমর্থন জানাইয়াছে না ব্যাপম কাণ্ডে হত্যাকে সমর্থন জানাইয়াছে? বাস্তব হইল—ব্যাপম কাণ্ড সম্পর্কিত প্রকৃত ঘটনা সংবাদপত্রে উপস্থাপিত হয় নাই, কেবল বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধীদের বক্তব্যই প্রচারিত হইতেছিল। মানুষ সংবাদপত্রের এবং বিরোধীদের এই অপপ্রচার সমর্থন করেন নাই বলিয়া বিজেপি বিপুল ভাবে জয়ী হইয়াছে। ব্যাপম কেলেঙ্কারিতে যতজনের মৃত্যু হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গে সারদা কেলেঙ্কারিতেও মৃত্যুর সংখ্যা তাহা হইতে কম নয়। তাহা হইলে কেবল মোদীকে জব্দ করিতে এত হইহল্লা কেন? আসলে কংগ্রেস দলকে দুর্নীতির কারণেই মানুষ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। একজন দুর্নীতিবাজ অপরকে দুর্নীতিবাজ হিসাবে প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে তাহার সঙ্কট আরও ঘনীভূত হইবে, তাই কংগ্রেসের এই কৌশল।

পুণের ফ্লিম ইনস্টিটিউট লইয়াও একই অবস্থা। কংগ্রেস আজ গজেন্দ্র চৌহানের পদত্যাগ দাবিকে সমর্থন জানাইতেছে অথচ কংগ্রেসী আমলে মহেশ ভাটের পদত্যাগের দাবিতে যখন এই সংস্থার ছাত্ররা আন্দোলন করিতেছিল তখন কংগ্রেস তাহার বিরোধিতা করিয়াছিল। আজ রাহুল গান্ধী নরেন্দ্র মোদীকে স্বৈরাচারী বলিতেছেন, অথচ এই কংগ্রেসই তাহাদের আমলে ছাত্রদের আন্দোলনের মান্যতা দেয় নাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুণায় ছাত্রদের আন্দোলনে সমর্থন জোগাইতে প্রতিনিধি পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন, অথচ তাঁহার নিজের রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনকে নিন্দা করিতেছেন। এই দ্বিচারিতা কেন? পরে অবশ্য প্রেসিডেন্সির ছাত্রদের বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় ওঠায় পুণাযাত্রা স্থগিত রাখা হইয়াছে।

'একপদ এক পেনশন'-এর দাবি লইয়া প্রাক্তন সেনানীরা আন্দোলন করিতেছেন। রাহুল গান্ধী সেনাদের সভায় গিয়া এই দাবিকে সমর্থন জানাইতেছেন। অথচ কংগ্রেস আমলেই সেনারা এই দাবি লইয়া আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কংগ্রেস তখন সেই আন্দোলনকে মান্যতা দেয় নাই, সেইদিন রাহুল গান্ধীও নিশ্চুপ ছিলেন। বরঞ্চ বিজেপি তাহাদের ইস্তাহারে সেনাদের এই দাবিকে সমর্থন করিয়াছিল। ক্ষমতায় আসিয়া বিজেপি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর—সেকথা প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা দিবসের ভাষণেও উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থের সংস্থান করিতে হইবে বলিয়া ইহার বিলম্ব ঘটিতেছে। সরকারের উচিত দ্রুত এই বিষয়ে সমাধান করা।

কেবল মোদীকে জব্দ করিতে রাহুল গান্ধী কাশ্মীরে যাইতেছেন। কংগ্রেসের প্রচার চলিতেছে তাহারা ক্ষমতায় না থাকিলেই কেবল দেশ আক্রান্ত হইয়া থাকে। কাহাদের জন্য আজ কাশ্মীরের এই অবস্থা তাহা সকলেরই জানা। তাই কংগ্রেস মানুষের সমর্থন হারাইয়া নানা অপচেষ্টা চালাইতেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদের বিরোধিতার অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু সেই বিরোধিতা সত্য তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই হওয়া উচিত। অন্যদিকে সরকারি দলের উচিত এই সকল দ্বিচারিতার প্রবল প্রতিবাদ করা। সরকারি দলের প্রতিবাদ ঠিক মতো হইতেছে না বলিয়াই বিরোধীদের কথা প্রবলভাবে শোনা যাইতেছে। মানুষ প্রথমে ইহাতে বিভ্রান্ত হইলেও যখনই সত্য জানিতে পারিয়াছে, তখনই তাহার মুখের মতো জবাব দিয়াছে। মধ্যপ্রদেশের সাম্প্রতিক পুরভোটের ফলাফলই তাহার প্রমাণ।

সুভাষিতম্

নারিকেলসমাকারা দৃশ্যন্তেঽপি হি সজ্জনাঃ।
অন্যে বদরিকারা বহিরেব মনোহরাঃ।।
সজ্জন ব্যক্তিরা নারিকেলসদৃশ হন। অন্যেরা বদরিকা (কুল) ফলের মতো, কেবল দেখতেই সুন্দর।

‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’-এর সমীক্ষায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

মুসলমান ভোটের লোভে বিহারে পরিকল্পনা-মাফিক দাঙ্গার ছক সুবিধাবাদী জোটের

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বিহারে বিজেপি-কে রুখতে নীতীশ-লালু-কংগ্রেসের সুবিধাবাদী জোটের ভরসা এখন ‘সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা’র রাজনীতি-ই। এই জোট ইদানীংকালে তৈরি হলেও দাঙ্গার রাজনীতির খেলা যে নীতিশ বহু আগেই শুরু করে দিয়েছিলেন ইংরেজি সর্বভারতীয় দৈনিক ‘দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে’র একটি সমীক্ষায় তা স্পষ্ট হয়েছে। ২০১০-এর জানুয়ারি থেকে ২০১৩-র জুন অবধি যতদিন বিজেপি-জে ডি ইউ জোট ক্ষমতায় ছিল, এই সাড়ে তিন বছরে বিহারে ‘দাঙ্গার ঘটনা’র সংখ্যা ছিল ২২৬। ২০১৩-র জুনে বিজেপি-র নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে তুলে ধরা-কে কেন্দ্র করে এন ডি এ ছাড়েন নীতিশ। সেই থেকে এখনও অবধি বিহারের দাঙ্গার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে উত্তরোত্তর। ২০১৩-র জুন থেকে ২০১৫-র জুলাই— এই দু’ বছরের সামান্য কিছু বেশি সময়ে বিহারে দাঙ্গার সংখ্যা ৬৬৭টি। তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন, মুসলমান ভোটের জুজু দেখে নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরতে ভয় পেয়েছিলেন নীতিশ। কিন্তু তারপরেও মোদী-র জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করে শুধু ‘সাম্প্রদায়িক রাজনীতি-ই নয়, দাঙ্গার তাস খেলতেও আর দ্বিধা করেননি তিনি।

রাজ্যের ৩৮টি জেলার মধ্যে ১৮টি জেলাতেই এ ধরনের দাঙ্গার সংখ্যা ৭০ শতাংশ ছাড়িয়েছে। বেছে বেছে সেই এলাকাগুলিকেই ‘টার্গেট’ করা হচ্ছে যেখানে বিজেপি-র জোটে জয়ের বিপুল সম্ভাবনা। লক্ষণীয়ভাবে নালন্দা, জেহানাবাদ কিংবা সরণের মতো এলাকাগুলিতে দাঙ্গার সংখ্যা প্রথম সাড়ে তিন বছরের তুলনায় পরের দু’ বছরে বিপুল হারে বেড়েছে। অর্থাৎ ২০১০-র জানুয়ারি থেকে ২০১৩-র জুন পর্যন্ত যেখানে নালন্দা, জেহানাবাদ এবং সরণে ‘সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা’র সংখ্যা ছিল যথাক্রমে মাত্র ৫, ৫, ৩; ২০১৩-র জুন থেকে ২০১৫-র জুন পর্যন্ত সেই সংখ্যাই দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২০, ১৯, ১৬। হিন্দুদের কীভাবে এই জায়গাগুলিতে অকারণে উত্তেজিত করা হচ্ছে তার একটা নমুনা হলো— নালন্দা-য় প্রতি বছর-ই মহরমের মিছিল হয়। কোনোদিন কোনো বড়ো গণ্ডগোলের খবর পুলিশি খাতায় লিপিবদ্ধ হয়নি। পরিস্থিতি-র বদল হলো ২০১৩ সালের ১৬ নভেম্বর এবং ২০১৪ সালের ১৮ অক্টোবর মহরমের দিন। এই দু’বছরই একটি শিবমন্দির লক্ষ্য করে যখন গো-মাংস নিক্ষেপ করা হলো।

গোটা বিহারে এই মুহূর্তে মুসলমান জনসংখ্যা শতাংশের হারে ১৬.৫। এই শতাংশের নিচে বিহারের যে ২৪টি জেলায় জনসংখ্যা রয়েছে ২০১৩-র জুন থেকে আজ পর্যন্ত সেখানে দাঙ্গার সংখ্যা ৪১৮। শতাংশের বিচারে ৬২.৬। জে ডি ইউ সুকৌশলে যতই এই দাবি ভাসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুক যে হিন্দু ভোট-কে একত্র করতেই বিজেপি এধরনের দাঙ্গায় উস্কানি দিচ্ছে, রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা কিন্তু এর সঙ্গে স্পষ্টতই ভিন্নমত পোষণ করছেন। তাঁরা বলছেন, হিন্দু যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তাদের এককাট্টা করার জন্য দাঙ্গা বাঁধানোর প্রশ্ন অবান্তর। বরং জাতপাতের কারণে বহুধাবিভক্ত হিন্দু ভোটের সুবিধা নিতে মুসলমান ভোটে একাধিপত্য কায়েমের সুযোগ- সুবিধা সর্বাধিক। আর নীতিশ-লালু-কংগ্রেসের সুবিধাবাদী জোট এই সুযোগকেই কাজে লাগাতে মরিয়া। তাই পরিকল্পনা-মাফিক ছক কষা হয়েছে দাঙ্গার।

এর স্বপক্ষে তথ্য দিতেও ছাড়ছেন না তাঁরা। যেমন ওই ২৪টি জেলার ২২টি লোকসভা আসনে গত নির্বাচনে একক কৃতিত্বে জয়লাভ করে বিজেপি। তার আগের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি জে ডি ইউ-এর সঙ্গে জোট বেধে এখানে ১২টি আসনে জয়লাভ করেছিল। সেবার বিজেপি রাজ্যে পেয়েছিল ১৫টি লোকসভা আসন। ১২টি বাদে বাকি তিনটি হলো কাটিহার, আরারিয়া ও পূর্ণিয়া। এই তিনটি আসন-ই মুসলমান অধ্যুষিত, যথাক্রমে ৪৩, ৪১ ও ৩৭ শতাংশ মুসলিম ঘনজনবসতিপূর্ণ। সুতরাং নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নযজ্ঞে বিহারকে সামিল হতে না দিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফায়দা তোলাই যে নীতিশ-লালু-কংগ্রেসের আশু লক্ষ্য তা স্পষ্ট বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন।

সেরা দশ*

জেলা	জুন '১০-'১৩	জুন '১৩-জুলাই '১৫	মুসলমান সংখ্যা
গয়া	২১	৩৯	১২%
মুজফফরপুর	৬	৩৫	১৫%
বেতিয়াহ	১১	৩৩	২১%
সিওয়ান	২০	৩৩	১৮%
দ্বারভাঙ্গা	১০	৩২	২৩%
পাটনা	১৬	৩১	৮%
সিতামারি	১০	২৯	২১%
নাওয়াদা	৮	২৮	১১%
নালন্দা	৫	২২	৭%
রোহতাস	৯	২১	১০%

*বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংখ্যা বৃদ্ধির নিরিখে প্রথম স্থানে থাকা দশটি জেলা ।

সূত্র : পুলিশ থানার রেকর্ড, এফ আই আর, কেস ডায়েরি।

রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাস্টের বিরুদ্ধে জমি জালিয়াতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধীর তথাকথিত 'স্যুট বুট কী সরকার'-কে সরিয়ে তাঁর পরিধেয় 'কুর্তা পাজামার সরকার' অর্থে 'গরিবের সরকার' ফিরিয়ে আনার ডাক দেওয়ার তিন দিনের মধ্যেই বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। গত লোকসভা নির্বাচনে রাহুল গান্ধীর কাছে সামান্য ভোটে হেরে যাওয়ায় স্মৃতি অভিযোগ করেছেন তাঁর ও রাহুলের নির্বাচনী কেন্দ্র আমেথিতে একটি প্রস্তাবিত সাইকেল কারখানার ৬৫ একর জমি গান্ধীদের পরিচালিত ব্যক্তিগত ট্রাস্ট কারচুপি করে কিনে নিয়েছে।

স্মৃতি ইরানি

রবিবার আমেথিতে পঁচিশ হাজার মহিলাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী বিমা সুরক্ষা যোজনার প্রথম প্রিমিয়াম দিয়ে বিমা চালু করা সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠান মঞ্চে তিনি ওই বিতর্কিত জমির দলিল (Registered Auction Deal) জনসমক্ষে প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মিডিয়ার উদ্দেশ্যে স্মৃতি বলেন যে তাঁরা নিশ্চয় রাহুলের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক বিষোদগারের উত্তর তাঁর কাছ থেকে শুনতে এসেছেন। এর পরই বিষয়ান্তরে গিয়ে তিনি বলেন, মিডিয়ার মধ্যে কেউ কি 'সম্রাট বাই সাইকেল' সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন? মিডিয়ার নীরবতা ভেঙে মন্ত্রী নিজেই বলেন, গত আশির দশকে গরিব কৃষকদের কাছ থেকে নতুন সাইকেল কারখানা হলে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে তৎকালীন সরকার ৬৫ একর উর্বর কৃষিজমি সম্রাট সাইকেলকে পাইয়ে দেয়। অবশ্যই সেই সময় কোনো মোদী সরকার ক্ষমতায় ছিল না এবং ইরানির বয়সও ছিল নিতান্তই কিশোরীর। কিন্তু এই সাইকেল কোনোদিনই চলেনি। কেননা কারখানাই খোলা হয়নি।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে 'রাজীব গান্ধী চ্যারিটেবল ট্রাস্ট' এই জমি কোম্পানির কাছ থেকে কিনে নিয়েছে। ইরানি বলেন, জমিটি নিলামের মাধ্যমে বিক্রি হয়েছে। ওইদিন ইরানির সঙ্গে আসা উমাশঙ্কর পাণ্ডে জানান তিনি ইতিমধ্যেই এই নিলামকে অবৈধ ঘোষণা করতে উত্তরপ্রদেশ স্টেট ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন-এর কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছেন। পাণ্ডে আরো বলেন, ইউ পি এস আই ডি সি এই মর্মে নির্দিষ্ট অধিকর্তাদের কাছে এই জমি ট্রাস্টের স্বপক্ষে হস্তান্তর মুলতুবি করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

প্রসঙ্গত আমেথি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে লেখা ইউপিএসআইডিসি- এর রিজিওনাল ম্যানেজারের চিঠিটি সংবাদপত্রের হাতে এসে পৌঁছেছে। যার বিষয়বস্তু অনুযায়ী 'সম্রাট বাইসাইকেল' সংস্থার পক্ষে ৯০ বছরের মেয়াদি লিজে উল্লেখিত ৬৫.৫৭ একর জমি ৮ আগস্ট ১৯৮৬ সালে চুক্তিকৃত হয়। ইতিমধ্যে ওই সংস্থা কারচুপির মাধ্যমে ল্যান্ড রেকর্ড-এ 'লিজের' পরিবর্তন ঘটিয়ে জমির স্বত্ব তাদের সংস্থার পূর্ণ মালিকানাধীন করে নেয়। এ কথাও সরাসরি উল্লেখিত হয়েছে। এই অবৈধ মালিকানার জমিটিরই বর্তমান মালিক 'রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট' বলে স্মৃতির দাবি।

রাজস্থানের পুরভোটেও জয়ী বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মধ্যপ্রদেশের পর এবার রাজস্থানেও পুরভোটে জয়লাভ করল বিজেপি। ১২৯টি পুরসভার মধ্যে ৮৭টিতেই জয়লাভ করেছে বিজেপি। পুরসভাগুলির মোট ৩৩৫১টি ওয়ার্ডের মধ্যে বিজেপি জিতেছে ১৪৩৫টিতে। আর কংগ্রেস পেয়েছে ১১৬২ ওয়ার্ড। বাকি দলগুলি সব মিলিয়ে জিতেছে মাত্র ৭৫৪টি ওয়ার্ডে। রাজস্থানে ১২৯টি পুরসভায় ভোটের প্রকাশিত ফলে এই চিত্র উঠে এসেছে। এই পুরসভাগুলির মধ্যে আজমির মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ১৫টি মিউনিসপ্যাল কাউন্সিল এবং ১১৩টি মিউনিসিপ্যালিটি রয়েছে। তবে ভোটের এই ফলাফলে বিজেপি চিন্তার কারণও আছে।

বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া

লোকসভা ভোটের তুলনায় বিজেপি-র প্রাপ্ত ভোটের হার ১৮ শতাংশ কমেছে। অন্যদিকে ৪ শতাংশ হলেও কংগ্রেসের বেড়েছে।

বিজেপি-র আরও অস্বস্তির কারণ হলো ঝালাওয়ার, ঝালরাপাটন এবং ঢোলপুর পুরসভায় বিজেপি জয়লাভ করতে পারেনি। এই তিনটি পুরসভাই রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে ও তাঁর পুত্র দুষ্মন্ত সিংহের সংসদীয় নির্বাচন ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে।

নুরজাহান সাফিয়া নিয়াজ

বহু বিবাহ ও তিনতালাকে বিপক্ষে মুসলমান মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বছরের পর বছর ধরে চলে আসা বহু বিবাহ ও তালাকের মতো একটি ঘৃণ্য প্রথার অবসান চাইছে মুসলমান সমাজের মহিলারা। মুসলমান সমাজে সংস্কারের উদ্দেশ্যে কাজ করে চলা সংস্থা 'ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলন'-এর করা সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে। ভারতের ১০টি রাজ্যের মধ্যে এই সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। ২০১৩-র জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ৫,৭১০ জন মহিলার উপর চলা সমীক্ষায় ৯১.৭ শতাংশ মহিলা মুসলমান পুরুষদের বহু বিবাহের এবং ৮০ শতাংশ মহিলা তিন তালাকের বিরোধিতা করেছেন। মুসলিম মহিলা আন্দোলনের প্রধান নুরজাহান সাফিয়া নিয়াজের কথা অনুসারে শুধুমাত্র ২০১৪-তেই মহিলা শরিয়া আদালতে ২৩৫টি কেস এসেছে, সেগুলির ৮০ শতাংশই মৌখিক তালাকের শিকার। ৯০ শতাংশ মহিলাই চান এক তরফা বিবাহ বিচ্ছেদ না হয়ে সালিশির মাধ্যমে তা সম্পন্ন হোক। ৮৩ শতাংশ মহিলা মুসলমান পারিবারিক আইনের বদল চান। শ্রীমতী নিয়াজ মুসলমান মহিলাদের 'মুসলিম পার্সোনাল ল' বদল করার ইচ্ছার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এই ইস্যুগুলিকে সরকার, ল' কমিশন এবং ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেন-এর কাছে তুলে ধরবে বলে মনস্থির করেছে।

ভারতের চাপে স্পিকার সম্মেলনে পিছু হটল পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত আগেই জানিয়ে দিয়েছিল জম্মু-কাশ্মীরের স্পিকারকে আমন্ত্রণ না জানালে ভারত পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত স্পিকার সম্মেলন বয়কট করবে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত পাকিস্তানে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (সিপিইউ)-এর সম্মেলন হবে বলে স্থির ছিল। পাকিস্তান জম্মু-কাশ্মীরের স্পিকার কবীন্দ্র গুপ্তকে ওই সম্মেলনে আমন্ত্রণ করতে রাজি না হওয়ায় ভারত সম্মেলন বয়কট করবে বলে সাফ জানিয়ে দেয়। ভারতের এই চাপে পাকিস্তানকে পিছু হটতে হলো। পাক-ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির স্পিকার আয়েজ সিদিক (AyeZ Sadiq) কমনওয়েলথের সেক্রেটারিয়েট-কে জানিয়ে দিয়েছে— পাকিস্তান আর এই সম্মেলনের আয়োজন করতে রাজি নয়।

ব্যাঙ্গালোরে কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজেপি-র জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ব্যাঙ্গালোর কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজেপি বড়রকমের সাফল্য পেল। ১৯৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে বিজেপি ১০০টি আসনে জয়লাভ করেছে। কংগ্রেস ৭৫ এবং জে ডি এস ১৪টি আসনে জিতেছে। ২০১০-এর নির্বাচনে বিজেপি ১৯৮ আসনের মধ্যে ১১৬, কংগ্রেস ৬২, জে ডি এস ১৪ এবং নির্দল ৮টি আসন পেয়েছিল। এবারের জয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্ণাটক বিজেপি-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সংশোধনী

স্বস্তিকায় গত ১৫ আগস্ট ২০১৫ সংখ্যার ৬ পৃষ্ঠায় 'আবার ইসলামি তাণ্ডব কলকাতায়' সংবাদ প্রতিবেদনে ভুল ছবি প্রকাশিত হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

—সঃ স্বঃ।

সবার প্রিয় ®
বিল্লদা
চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

প্রতিদিন ৪০ হাজার উপভোক্তা রান্নার গ্যাসের ভরতুকি ছেড়ে দিচ্ছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডাকে প্রায় ম্যাজিকের মতো সাড়া দিয়ে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার পরিবার তাঁদের প্রাপ্য ভরতুকি সরকারি তেল ও গ্যাস কোম্পানিগুলির কাছে প্রত্যার্পণ করছে বলে খবর। উপভোক্তাদের এই স্বতঃপ্রণোদিত কাজে দেশের প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত আবেদন যে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে গ্রাহকদের এই সদিচ্ছাকে মর্যাদা দিতে সরকারি তেল কোম্পানিগুলিও বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গ্রাহকদের সই-সাবুদ করিয়ে গোটা প্রক্রিয়াটিকে সফল করে তুলছেন।

সংবাদসূত্র অনুযায়ী স্বাধীনতা দিবসের দিন প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে উল্লেখিত কুড়ি লক্ষ উপভোক্তার ভরতুকি ফিরিয়ে দেওয়ার সংখ্যাও ইতিমধ্যে ছাড়িয়ে গেছে। লক্ষণীয় ১৫ আগস্টের আহ্বানের একদিনের মধ্যে প্রত্যার্পণের সংখ্যা ২০ লক্ষ থেকে ১ লাফে ২১.২৬ লক্ষে পৌঁছয় এবং কয়েকদিনের মধ্যেই সেই সংখ্যা ২২.৫৬ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। এল জি পি সরবরাহকারী তেল কোম্পানিগুলির কর্তাদের বয়ান অনুযায়ী শুধু গত শনিবারেই (২২ আগস্ট ২০১৫) ২৯ হাজার পরিবার ভরতুকি প্রত্যার্পণ করেছে। এর সঙ্গে ধরতে হবে ৫০ হাজারের অধিক প্রত্যার্পণের দরখাস্ত যা সামান্য কিছু নিরীক্ষণের কারণে এই মুহূর্তে আটকে থাকলেও অচিরেই বাস্তবায়িত হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত গত ৩ আগস্ট সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রসাদ লোকসভায় জানান ২৮ জুলাই পর্যন্ত প্রায় ১৩.৮৭ লক্ষ গ্রাহক ভরতুকি ছেড়ে দিয়েছেন। মুম্বইয়ের NGO 'Watchdog fundation'-এর আহ্বায়ক Godfrey Pimenta তাঁর রাইট টু ইনফরমেশন-এর উত্তরে ১ জুলাই জানতে পেরেছিলেন ৭.৭৭ লক্ষ গ্রাহকের ভরতুকি প্রত্যার্পিত হয়েছে। এই তথ্য থেকে পরিষ্কার মাত্র ২৭ দিনের সময়সীমায় ভরতুকি ফেরতের সংখ্যা অভাবনীয়ভাবে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সরকারের আন্তরিকতায় আস্থা রাখছে এমনটাই ইঙ্গিত দিচ্ছে বিশেষজ্ঞ মহল। গ্যাস সরবরাহকারী কোম্পানির এক প্রবীণ কর্তা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সনির্বন্ধ আহ্বান সম্পদশালী ও উচ্চবিত্তদের মধ্যে এতটাই সাড়া ফেলেছে যে আমাদের সংস্থার লোকজন বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলির বাড়ি গিয়ে আবেদনের নির্দিষ্ট জায়গায় সই করতে বললেই তাঁরা দ্বিরুক্তি না করে তাঁদের অধিকার ছেড়ে দিচ্ছেন।

অসুরক্ষিত রেলযাত্রা : স্টেশন ও চত্বরে অপরাধের সংখ্যা বেড়েই চলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রেলে উত্তরোত্তর বেড়ে চলা অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ট্রেন এবং স্টেশন চত্বরে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ভার রাজ্য সরকারের হাত থেকে রেলমন্ত্রক নিজেদের দায়িত্বে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড (এন সি আর) দেওয়া সাম্প্রতিক তথ্য পরিসংখ্যানেই অপরাধের ঊর্ধ্বমুখী রেখাচিত্র উঠে এসেছে। ২০১৪ সালে রেল তথা রেল চত্বরে খুন হওয়ার সংখ্যা ২০১৩-এর তুলনায় (২৭০টি) বেড়ে হয়েছে ৩৯২টি। ধর্ষণের পরিসংখ্যানও এক বছরে একলাফে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে গেছে। ২০১৩-তে যেখানে ছিল ৫৪, ২০১৪-তে এসে সেই সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে ১২২। অপহরণ (৪৪০), চুরি (২২,৪৭৭), ডাকাতি (৮০) দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয় ট্রেন ও স্টেশন চত্বরে সংঘটিত খুনের রিপোর্ট (১২০) সবথেকে বেশি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের পরেই রয়েছে বিহার (৬০) ও উত্তরপ্রদেশ (৩০)। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ট্রেনের মধ্যে ধর্ষণের ঘটনাও সবথেকে বেশি ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে (৮৫)। এক্ষেত্রেও মধ্যপ্রদেশে (১১) ও মহারাষ্ট্র (৩)-কে পিছনের সারিতে ফেলে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। অবাক করার মতো ঘটনা হলো রেলে ডাকাতির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উঁচু সারিতে রয়েছে মহারাষ্ট্র (৭০৯), কর্ণাটক (৯৬) এবং দিল্লী (৩২)। অরাজকতার জন্য পরিচিত উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে ডাকাতির সংখ্যা নিতান্তই কম, যথাক্রমে ২৭ এবং ২২। এমনকী চুরির ক্ষেত্রেও প্রথম স্থান অধিকার করেছে মহারাষ্ট্র।

রেলে সন্ত্রাস রুখতে ও অপরাধমূলক কাজকর্ম বন্ধ করতে সুসংহত ও উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নিয়েছেন রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যাত্রীসুরক্ষার বিষয়টি রাজ্য নিয়ন্ত্রিত গভর্নমেন্ট রিজার্ভ পুলিশ (জিআরপি) দেখলেও। যখনই কোনো অঘটন ঘটে তখন তার দায় রেলের উপর এসে পড়ে। তাই জিআরপি-এর পরিষেবায় সন্তুষ্ট না হওয়ায় রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আর পি এফ)-এর হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে রেল।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিপিএমের রোপণ করা বিষবৃক্ষের বিষফল এখন ফলছে

ছাত্র রাজনীতি নিয়ে উত্তাল কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ তথা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের দাবি উপাচার্য অনুরাধা লোহিয়াকে পদত্যাগ করতে হবে। কেন? সেটাই বোঝা দুষ্কর। সম্ভবত তাদের দাবি যে উপাচার্য প্রেসিডেন্সির পঠনপাঠনে যথেষ্ট যত্নবান নন। কিন্তু যে বেলাগাম জঙ্গলরাজ গুটিকতক বামপন্থী ছাত্রছাত্রী প্রেসিডেন্সিতে কায়েম করেছে তাতে কোনো জ্ঞানীগুণী ভদ্রলোক অধ্যাপক সেখানে শিক্ষাদানে ইচ্ছুক হবেন না। সোজা কথায় প্রেসিডেন্সিতে পঠনপাঠনের পরিবেশটাই এখন আর নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রেসিডেন্সির মর্যাদা এখন তলানিতে। সত্যিকারের মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরা প্রেসিডেন্সি মুখো হচ্ছেন না। তাঁদের অভিভাবকরা ভয় পাচ্ছেন বাড়ির ছেলেমেয়েদের ওই কলেজে পাঠাতে।

শুধুই প্রেসিডেন্সি নয়, যাদবপুর এবং শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি (বেসু) ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি একই রকম অশান্ত। এর কারণ, সিপিএম আমলে রোপণ করা বিষবৃক্ষের বিষফল। সিপিএমের শিক্ষানীতির মূল কথাটি ছিল উপাচার্যদের প্রশ্নহীন আনুগত্য। উপাচার্য মানে পার্টির বশংবদ ব্যক্তি। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা অথবা প্রশাসনিক দক্ষতা না থাকলেও চলবে। সেই ব্যক্তি শাসকের হাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বশাসনের লাগাম সঁপে দিতে পিছপা হবেন না। এই ধারা এখন আরও জোরদারভাবে চালু রেখেছে তৃণমূল শাসকদল। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় গলাবাজি করে বলেন, 'আমরা বেতন দি। তাই উপাচার্যদের আমাদের কথা শুনে চলতে হবে।' রাজ্যের প্রাক্তন কমিউনিস্ট শাসকরা পার্টির একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ব্যক্তি একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী। সমস্যাটা হচ্ছে প্রাক্তন এবং বর্তমান শাসকেরা সকলেই মধ্য বা নিম্ন মেধার ব্যক্তি। এদের কাছ থেকে শিক্ষার উন্নয়ন আশা করাটাই বৃথা।

গূঢ় পুরুষের কলম

পশ্চিমবঙ্গের ছোট বড় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন দুর্বৃত্তায়ন চলছে। অনেকেরই হয়তো মনে আছে শিবপুরের বেসুতে ছাত্র আন্দোলনের নামে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সৌমিক বসু খুন হয়ে যায়। দাঙ্গা হাঙ্গামা থামাতে ক্যাম্পাসে ১৪৪ ধারা জারি করতে হয়। ঘটনাটি ২০০৮ সালের। তখন শাসকদল সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এস এফ আই একচ্ছত্র রাজত্ব চালাচ্ছে প্রেসিডেন্সি, যাদবপুর এবং শিবপুরের বেসুতে। ইউনিয়ন দখলে রাখতে এস এফ আই এবং বিরোধী ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনসলিডেসন (আই সি) যথেচ্ছভাবে বোমা পিস্তলের ব্যবহার করেছে। সিপিএম নেতা অনিল বিশ্বাস এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কন্যাদ্বয় তখন দাপিয়ে বেড়াতেন প্রেসিডেন্সি চত্বরে।

রাজ্যের কলেজে কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের দখল রাখার লড়াই এবং চুন, বালি, সিমেন্টের সিন্ডিকেট রাজের লড়াইয়ের চরিত্রগত পার্থক্য নেই বললেই চলে। এই দুইয়ের লক্ষ্যই হচ্ছে টাকা রোজগার। কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে শেষ কথা বলে ছাত্র ইউনিয়ন। ইউনিয়নের নেতাদের পকেটে ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকা গুঁজে দিয়ে অভিভাবকরা তাঁদের নিম্ন মেধার সন্তানদের ভাল ভাল বিষয়ে অনার্স বিভাগে ভর্তি করিয়ে দিচ্ছেন। যেমন, বড় বড় প্রমোটাররা বহুতল ভবন নির্মাণ করছেন অতি নিম্নমানের মালমশলা ক্ষমতাবান সিন্ডিকেটের কাছ থেকে নিয়ে। যাঁরা এইসব আবাসিক ভবনে ফ্ল্যাট কিনেছেন তাঁরা জানেন দুই তিন বছরেই ফ্ল্যাটের চারধারে ফাটল দেখা দিচ্ছে। প্রমোটার বেপাত্তা। তাছাড়া কোনো প্রমোটারই লিখিত গ্যারান্টি দেন না যে প্রথম পাঁচ বছর নির্মাণে গলদ দেখা দিলে ফ্ল্যাটের মূল্য ফেরত দেওয়া হবে। তেমনি নিম্নমানের ছাত্রছাত্রীরা ঘুষ দিয়ে কলেজে ভর্তি হলেও পরবর্তীকালে তাদের কাছ থেকে ভাল কিছু আশা করা যায় না।

১৯১১ সালে বিধানসভার নির্বাচনের আগে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় ইস্তাহারে ঘোষণা করেছিলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনৈতিক দখলমুক্ত করা হবে। অথচ তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে উপাচার্যের ইস্তফা চাইলেন। মমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারের কাঠামোটাই ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। প্রেসিডেন্সির বর্তমান উপাচার্য অনুরাধা লোহিয়া মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহধন্যা। সে কথাটা তিনি নিজে আন্দোলন চলাকালে প্রেসিডেন্সিতে এসে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া প্রেসিডেন্সির মেন্টর সুগত বসু এখন তৃণমূলের সাংসদ। বাম আমলে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের যে ধারাটা ছিল তারই ধারাবাহিকতা এখন জোর কদমে চলছে।

বাঙালির দুর্ভাগ্য যে শিক্ষাক্ষেত্রে অমাবস্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও আমরা তা মেনে নিচ্ছি। হয়তো মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের সামনে অন্য কোনো বিকল্প নেই।

প্রেসিডেন্সিতে 'ব্রেসিয়ার বিপ্লব', পড়ুয়াদের দোষ নয়

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

এক কঠিন সময়ে দাঁড়িয়ে এই চিঠি লিখছি। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রের ব্রেসিয়ার পরা ছবি আপনারা সকলেই দেখেছেন। এর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিবাদী পড়ুয়াদের স্যানিটারি ন্যাপকিন ঝুলিয়ে দেওয়া দেখেছেন। রাজ্যপালকে অপমান করা দেখেছেন। এবার মুখ্যমন্ত্রীকে ঘেরাও করে কালো পতাকা দেখানোটাও দেখলেন। পুনায় এফটি আই আই-এ এক অন্যায় দাবি নিয়ে দিনের পর দিন আন্দোলনের নামে অরাজকতা চালিয়ে আসছে একশ্রেণীর পড়ুয়া। এতগুলো উদাহরণে সভ্য সমাজে সুস্থ আচরণ বলতে যা বোঝায়, 'ছাত্রছাত্রী'দের কীর্তিকলাপ তার সীমা সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করেছে। এর নিন্দা করে সবাই আতঙ্কজনক এবং নিন্দনীয় বলছেন। আমি কিন্তু তাদের দলে নেই। আমার মনে হয়েছে এটাই স্বাভাবিক আচরণ। ছাত্ররা কাদের থেকে শিখছে সেটা ভাবছে কী কেউ?

শুধু এ রাজ্যেই নয়, গোটা দেশেই সব কিছুর পিছনেই আছে রাজনীতির মদত। প্রশাসনের আদর। তাই বিষবৃক্ষের ফল যতই ভয়াবহ হোক মেনে তো নিতেই হবে। তবে দেশের সঙ্গে বাংলার একটাই তফাত, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাজগতে সেই বিষবৃক্ষ উচ্চফলনশীল। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ফলন দেখাল। গাছ না থাকলে তো ফল ফলত না। একদিন সিপিএম স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দলতন্ত্র লালন করেছে। আজ সিপিএমের সফল ছাত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল করছে। অনিলায়ন থেকে মমতায়ন এক নিরবচ্ছিন্ন যাত্রা। পার্কস্ট্রিট ধর্ষণ থেকে জামুড়িয়ার শ্যাম সেল কারখানায় অচলাবস্থা— এর আগে একের পর এক গোলমালে 'ছোট ঘটনা'র তকমা দিয়েছেন মমতা। ভাবমূর্তি বাঁচাতে অভিযুক্তকে দল থেকে তড়িঘড়ি বহিষ্কারের নজিরও ভুরি-ভুরি। আবার তাঁরা সসম্মানে ফিরেও এসেছেন। একটু আড়ালে থাকেন। কারণ, তিনি জানেন মানুষের স্মৃতি বড় দুর্বল। ধর্ষণ থেকে গুণ্ডামি— হইচই হতেই 'ছোট ঘটনা' বলে ঝেড়ে ফেলার রাস্তা দেখিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটা তিনি বাম জমানার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু, বুদ্ধবাবুদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। আবার তাঁর দেখানো রাস্তাতেই হাঁটছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তথা তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। রাজ্যে পরপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মামলা নিয়ে তিনিও বলেছেন, ''চার-পাঁচটি ছোট ছোট ঘটনা ঘটেছে। সব এমন ভাবে প্রচার করছেন যেন কত কিছু হয়ে গিয়েছে।'' সবং-এ কলেজের মধ্যে ছাত্র খুন তো সত্যিই ছোট ঘটনা!

ছোটরা ছোট ঘটনা ঘটাক। এবার একটু বড়দের ছোট ঘটনা মনে করাই। একবার রেগেমেগে লোকসভার স্পিকারের দিকে শাল ছুঁড়ে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে আর এক বার কাগজ কুচি কুচি করে ছুড়ে দিয়েছিলেন স্পিকারের দিকে! সম্প্রতি সংসদীয় শিষ্টাচারের বেড়া টপকে গেছেন পশ্চিমবঙ্গের আর এক সাংসদ। বহরমপুরের কংগ্রেস সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। লোকসভার ওয়েল থেকে দু'ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে স্পিকার সুমিত্রা মহাজনের উদ্দেশে চিৎকার করা ও সভায় প্ল্যাকার্ড দেখানো পর্যন্তও ঠিক ছিল, পরে তিনি প্রায় স্পিকারের টেবিলেই উঠে পড়ছিলেন। একদিনের জন্য সাসপেন্ড করা হয় তাঁকে। যদিও সুমিত্রা মহাজন গোটা বাদল অধিবেশনের জন্যই সাসপেন্ড করতে চেয়েছিলেন। পরে তো একই রকম আচরণের জন্য কংগ্রেসের ২৫ জনকে পাঁচ দিনের জন্য সাসপেন্ড করতে হয়। এসব ঘটনাও কিন্তু ছোট ঘটনা। স্পিকারের অবমাননা করার দায়ে অধীরকে গোটা বাদল অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করতে চেয়ে প্রস্তাব এনেছিল বিজেপি। কিন্তু সেটাকে কংগ্রেস সাংসদের প্রতি শাসক দলের 'প্রতিহিংসাপূর্ণ আচরণ' আখ্যা দিয়ে রুখে দাঁড়ায় তৃণমূল এবং সিপিএম! প্রথমে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় এবং পরে সিপিএমের মহম্মদ সেলিম।

সেই অধীর এবার জামা খুলে মস্তানি দেখালেন রাস্তার মধ্যে। ভুলে গেলেন তিনি একজন সাংসদ। ভুলে গেছেন তিনি ঐতিহ্যবাহী প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। ভুলবেন না কেন? তাঁর দিদিমণি শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধীও তো দেখিয়েছেন সংসদের ওয়েলে নামা যায়। ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে এ ব্যাপারে তিনিই প্রথম। কংগ্রেস প্রধানদের ইতিহাসে, গান্ধী পরিবারের ইতিহাসে ওয়েল নেমে প্রতিবাদেও এ এক অনন্য নজির। তার আগে হাতের বাজুতে কালো কাপড় বেঁধে সংসদের বাইরে গলার শিরা ফুলিয়ে স্লোগানবাজিতেও ইতিহাস গড়েছেন তিনি। সোনিয়া নিজেই আবার বলেছেন, এসব ব্যাপারে তাঁর মাস্টারনি আমাদের দিদি। এ বাংলার জন্য সত্যিই গৌরবের! বামেদের ছাত্রী মমতা। মমতার ছাত্রী সোনিয়া। আবার তাঁর ছাত্র অধীর জামা খুলে বুক চিতিয়ে বলছেন, ''মারুন। ক্ষমতা থাকে তো আমার বুকে গুলি করুন।'' এর পর অধীরের এক ছাত্রও কলেজ দাপাল খালি গায়ে।

তাই প্লিজ শুধু প্রেসিডেন্সি বা অন্য জায়গার পড়ুয়াদের দোষ দেবেন না। এটাই প্রতিবাদের নতুন সংস্কৃতি। পণ্ডিতরাই বলে গেছেন, মহাজনরা যে পথে গমন করেন সেটাই শ্রেয়...

— **সুন্দর মৌলিক**

গরিবি হঠাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

স্বাধীনতার প্রথম সকাল থেকেই কংগ্রেস সরকারের থিম স্লোগান ছিল, 'গরিবি হঠাও'। সরকারের এই স্লোগানকে ইন্দিরা গান্ধী গণস্লোগান বানিয়ে ফেলেছিলেন— 'গরিবি হঠাও, দেশ বাঁচাও'। এতে গলা মিলিয়েছিলেন দেশের আমজনতা, যার জোরে একাত্তরের নির্বাচন তিনি হেলায় জিতেছিলেন। অথচ যাঁদের জন্য কান্নাকাটি করে তিনি 'গরিবের মা' হয়ে গেলেন, তাঁরাই পড়ে রইলেন অন্ধকারে। অর্থনীতির উন্নয়নে যে ব্যয়-বরাদ্দ হলো তার মাত্র চার শতাংশ গেল গরিবের উন্নয়ন খাতে আর তার ছিটেফোঁটা গিয়ে পড়ল গরিবের পাতে! ইন্দিরার পর রাজীব গান্ধী এবং পরবর্তীকালের কংগ্রেস ও কংগ্রেস চালিত ইউপিএ সরকারও একই স্লোগান চালিয়ে এসেছে। বিষয়টা এতটাই জনমোহিনী ছিল যে স্রেফ এতে ভর করেই তাঁরা দশকের পর দশক জিতে গেছেন। ২০০৪ সালের নির্বাচনের ঠিক আগে গরিবি নিয়ে আরেকটা নতুন স্লোগান চালু হল— 'আম আদমি কো ক্যা মিলা?' এই স্লোগান কিন্তু কংগ্রেস বিরোধীদের ছিল না, ছিল স্বয়ং ইন্দিরার পুত্রবধূ তথা কংগ্রেস সুপ্রিমো সোনিয়া গান্ধীর। ততদিনে কংগ্রেস একাই ৪৩ বছর দেশ শাসন করে ফেলেছে। এমনকী তারপরও কংগ্রেসের জোট সরকার (ইউপিএ) টানা দশ বছর ক্ষমতায় ছিল। অর্থাৎ কংগ্রেস দল প্রকারান্তরে কাবুল করল যে তাঁরা গরিবের জন্য কাজের কাজ কিছুই করেননি। আর সেটা যে একশোভাগ খাঁটি তার প্রমাণ আজ মিলছে হাতে নাতে।

২০১১ সালে শুরু হওয়া এবং সম্প্রতি আংশিকভাবে প্রকাশিত আর্থ-সামাজিক জাতিভিত্তিক জনশুমারি গ্রামভারতের অর্থনীতির অতি করুণ ছবি তুলে ধরেছে যাতে দেখা যাচ্ছে যে এখনও গ্রামীণ ভারতের অর্ধেক পরিবার অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে বঞ্চিত তথা গরিব। মাত্র ১.৬ শতাংশ পরিবার অকৃষিনির্ভর বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল এবং ৫১ শতাংশ মানুষ ঠিকা শ্রমিকের কাজ করেন যাঁরা বছরের কোনো না কোনো সময় কর্মহীন।

ইউপিএ সরকারের আমলে পরিকল্পনা আয়োগ মাথাপিছু দৈনিক খরচের ভিত্তিতে দারিদ্র্য মাপতে সুরেশ তেণ্ডুলকর কমিটি গড়ে যার আসল উদ্দেশ্য ছিল গরিবের সংখ্যা কম করে দেখানো। এই কমিটি নির্দিষ্ট করে দেয় যে, ২০১১-১২ সালের হিসেবে যাঁদের দৈনিক মাথাপিছু খরচ গ্রামাঞ্চলে ২৭ টাকা এবং শহরে ৩৩ টাকার উপর তাঁদেরকে আর গরিব বলা যাবে না। এই হিসেবে তাঁরা ২২ শতাংশ লোককে গরিব বলে নির্দিষ্ট করে। হাস্যকর এই হিসেবে দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। বিপদ বুঝে সরকার তড়িঘড়ি করে সি রঙ্গরাজনকে মাথায় বসিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ দল বানায় যাঁরা এই সীমাকে বাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলে ৩২ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ৪৭ টাকা করে যাতে দারিদ্র্যের অনুপাত দাঁড়ায় ২৯.৫ শতাংশ। কিন্তু এই হিসেবও অবাস্তব বলে যথেষ্ট বিতর্ক তৈরি হয়। দেশে গরিবের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রকৃত চিত্র প্রকাশ করতে সরকারের উপর চাপ বাড়ে। শেষমেশ নিরুপায় হয়েই সরকার ২০১১ সালে জাতিভিত্তিক আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা শুরু করে। এই সমীক্ষার কাজ দু'বছরের মধ্যে শেষ হলেও সরকার ২০১৪ সালের নির্বাচনের কথা ভেবে ভয়ে এর ফল প্রকাশ করেনি। বর্তমান সরকার অনেক কসরত করে শেষপর্যন্ত এই সমীক্ষার প্রতিবেদন আংশিকভাবে সামনে আনতে সক্ষম হয়। স্বাধীন ভারতে এইরকম শুমারি প্রথম যা গ্রামের মানুষেরা কী ধরনের ঘরে বসবাস করে, তাদের পেশা কী, তাদের কী কী সম্পত্তি আছে, ভিখারির সংখ্যা কত, কতজন কাগজ কুড়িয়ে বেঁচে আছে ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়ে অনুসন্ধান করেছে। এতে কিন্তু হতাশাজনক ছবিই ধরা পড়েছে যা সাধারণত সরকারিভাবে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের সঙ্গে মেলে না। এই সমীক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হল, গ্রামের ১৭.৯১ কোটি পরিবারের মধ্যে ৮.৬৯ কোটি পরিবারই শুমারির নথিবদ্ধ সাতখানা মাপকাঠির নিরিখে এক বা একাধিক মাপকাঠিতে আর্থ-সামাজিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত, ৬৪ শতাংশ গ্রামবাসী নিরক্ষর এবং এক-তৃতীয়াংশ গৃহহীন। এই মাপকাঠিগুলো হলো— পাকাবাড়ি নেই এমন পরিবার, পরিবারে প্রাপ্তবয়স্ক উপার্জনশীল ব্যক্তি নেই এমন মহিলাচালিত পরিবার যেখানে উপার্জনক্ষম পুরুষসদস্য নেই, যে পরিবারের সদস্য প্রতিবন্ধী এবং যেখানে কোনো সক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক নেই, এমন পরিবার যেখানে ২৫ বছরের ঊর্ধ্বে প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য নেই, ভূমিহীন ঠিকা কায়িক শ্রমিক এবং তপশিলি জাতি-উপজাতি পরিবার। ২০০২ সালে ১৩টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে অনেকটা এই ধাঁচেই সমীক্ষা চালিয়েছিল বিজেপি সরকার যাতে গ্রামীণ ২৮.৩ শতাংশ পরিবারসহ দেশে ২৭.৫ শতাংশ পরিবার দারিদ্র্যসীমার নীচে ছিল। অর্থাৎ এই পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট যে গত দশ বছরে, ইউপিএ সরকারের আমলে স্লোগানই সার হয়েছে, গরিবের হাল ভয়ঙ্কর ভাবে খারাপ হয়েছে।

তবুও কংগ্রেস সরকার গরিবের জন্য ভাবেনি একথা একেবারেই বলা যাবে না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুর সময় থেকেই সরকার অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকল্প ঘোষণা করে দারিদ্র্য দূরীকরণে নজর দেয়। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া হয় যাতে যথেষ্ট সাফল্য পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে সরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার অনুকরণে বিপুল সরকারি বিনিয়োগ করা হয়। এতে একদিকে যেমন কৃষি মার খায়, তেমনি সরকারের ঘাড়ে বিপুল ঋণের বোঝা চেপে বসে। ১৯৭৫ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রাথমিকভাবে

২০ দফা কর্মসূচি চালু করেন। কী ছিল না এই কর্মসূচিতে! শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, গৃহ, কৃষি ও ভূমি সংস্কার, জলসেচ, পানীয়জল, দুর্বল শ্রেণীকে সুরক্ষা দান ও সবল করা, উপভোক্তা সুরক্ষা, পর্যাবরণ ইত্যাদি ৬৬টি বিষয় সম্বলিত একটি দীর্ঘ তালিকা তৈরি করে মনের যা যা ইচ্ছে ছিল সেগুলিকে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এই ২০ দফা কর্মসূচি তাঁকে রাজনৈতিক দিক থেকে চমৎকারভাবে সাহায্য করেছিল। স্বভাবতই, ১৯৮২ সালে একে পুনর্বিন্যাস করে আবার চালু করা হয়। এর সঙ্গে নতুন নতুন প্রকল্প জুড়ে ১৯৮৪ সালে একে ফের চালু করা হয় এবং সর্বশেষ ২০০৬ সালে ইউপিএ সরকার এর পুনর্বিন্যাস করে।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক সমীক্ষার প্রাথমিক তথ্য থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে শহরের অন্তত ৩৫ লক্ষ পরিবারের কোনো আয়ের উৎস নেই এবং ৯০ লক্ষ পরিবারের মাথা হলো মহিলারা যেখানে কোনো উপার্জনশীল পুরুষ নেই। অর্থাৎ ২০১১ সালের শুমারি থেকে এ মন্তব্য করাই যেতে পারে যে, প্রায় সাত দশক ধরে লাগাতারভাবে কর্মসূচি চলার পরও আমরা দেশে গরিব কমানোর লক্ষ্যমাত্রার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারিনি। কিন্তু কেন এমনটা হলো?

কারণ খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই যেটা উল্লেখ করা যায় তা হলো, গরিব কমানোর প্রচেষ্টায় আন্তরিকতার থেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই ছিল বেশি। ইন্দিরা সরকারের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে যে প্রবল ঝড় উঠেছিল তা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা না করতে পেরেই তিনি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে তিনি ব্যয় সংকোচ ও বঞ্চিত মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের নামে ঢালাও কর্মসূচি ঘোষণা করে জরুরি অবস্থা ঘোষণার যথার্থতাকে অর্থনীতির মানদণ্ডে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন। সম্পদের পুনর্বণ্টন মানেই যে সরকার ভরতুকি দিয়ে জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে জনগণকে সুবিধা পাইয়ে দেবে এই বদ্ধমূল ধারণার প্রচলন হয়। এতে সরকার সহজেই জনপ্রিয়তা লাভ করল আর জনগণও খুশি হলো। আইন করে খাবার, কাজ ইত্যাদি পাইয়ে দেবার নীতিকে গান্ধী রাজবংশ যে কল্যাণ অর্থনীতির সিংহাসনে বসিয়ে ফুল-বেলপাতা দিয়ে পুজো করে এসেছে, তাতে গ্রামীণ ভারতকে বড়জোর জিইয়ে রাখা যায়, তার অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সুবিধা 'চুঁইয়ে পড়া অর্থনীতি'-র কল্যাণে গরিবের ঘরে খুব কমই পৌঁছেছে। সমাজের উঁচুতলায় উন্নয়ন হবে আর তা বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তর বেয়ে গরিবের কাছে যাবে— এই নীতি আঁকড়ে থাকার কারণে গরিবের লাভ খুব কমই হয়েছে, বরং এ নিয়ে দেখা দিয়েছে অসংখ্য অনিয়ম আর দুর্নীতি।

তৃতীয়ত, ***গরিব গরিব করে গান্ধী পরিবার যখন দেশে এত ঢাক-ঢোল পেটাচ্ছিল ঠিক সেই সময়ই প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক ডব্লিউ. আর্থার লুইস (W. Arthur Lewis) পিছিয়ে পড়া দেশের উন্নয়ন আর দারিদ্র্য নিয়ে গবেষণা করছিলেন যে কথাটা অন্তত নেহরুবাদী অর্থনীতিবিদদের অজানা থাকার কথা নয়। তিনি দারিদ্র্য কমাতে শিল্পায়নের কথা বলেন।*** তাঁর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে তিনি একটি দ্বৈত অর্থনীতির উদাহরণ দেন যেখানে আছে শ্রমনিবিড় ও কম উৎপাদনশীল একটি চিরাচরিত ক্ষেত্র (কৃষি) এবং একটি আধুনিক ক্ষেত্র (শিল্প) যার উৎপাদনশীলতা বেশি, কেননা এটি পুঁজি নির্ভর। সার্বিক দারিদ্র্যের কারণে সেখানে সঞ্চয়ও কম হয়। এই পরিস্থিতিতে উন্নয়নের মূল নীতি হলো, বিদেশি পুঁজির সহায়তা নিয়ে শিল্পক্ষেত্রকে দ্রুত বাড়িয়ে তোলা। এর ফলে কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত শ্রমিককে শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগ করা যাবে। শ্রমিকের আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সঞ্চয়ও বাড়বে যেটাকে পরবর্তীকালে শিল্পের সম্প্রসারণে মূলধন হিসেবে ব্যাবহার করা যাবে। ***তাঁর মতবাদ অনুসারে একটা দেশ তখনই উন্নত হয় যখন তার কৃষিক্ষেত্র সংকুচিত হয় এবং শিল্পক্ষেত্র প্রসারিত হয়। এই গবেষণার জন্য তিনি ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরস্কার পান। অথচ নেহরুবাদী প্রশাসকরা এর ঠিক উল্টো পথে হেঁটেছেন।*** তাঁদের আমলে আর্থিক বৃদ্ধি হলেও তাঁরা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারেননি। এর পেছনে বড় একটা কারণ ছিল শিল্পের অভাব। কৃষি যে ভিত্তি নয় একথা উচ্চারণ করতে তাঁরা সাহস পাননি। এই আত্মঘাতী রাজনীতির মানসিকতা আজও তাঁদের দূর হয়নি। যখন নরেন্দ্র মোদী জরুরি ভিত্তিতে দেশে শিল্পের সওয়াল করছেন তখন কংগ্রেস ও তার নির্লজ্জ মানসিকতাযুক্ত আঞ্চলিক দলগুলি একযোগে বিরোধিতা করে তাঁর সরকারের গায়ে কৃষিবিরোধী তকমা লাগাতে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছে।

কৃষি উৎপাদনশীলতা কতখানি বাড়ানো যায়, কোন পথে কৃষিকে অধিকতর লাভজনক করে তোলা যায় এসব নিয়ে আজ ভাবতে হবে। কিন্তু একইসঙ্গে একথাও বুঝতে হবে যে কৃষি কখনই এত লাভজনক হয়ে উঠতে পারবে না যে তার উপর নির্ভর করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ভাল থাকবেন। এই শুমারির একটি লক্ষণীয় বিষয় যে গ্রামের অর্ধেক মানুষ আজ কৃষি ছেড়ে বিকল্প আয়ের পথে পা বাড়িয়েছেন। তাই মোদী সরকার 'বিনিয়োগ টানতে ব্যর্থ ২০১৩ সালের জমি নীতি' বদল করতে বদ্ধপরিকর। এ সরকার মান্ধাতা আমলের শ্রমনীতিকেও সংস্কার করে বিনিয়োগমুখী করে তুলেছে।

জাতিভিত্তিক আর্থ-সামাজিক জনগণনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ উন্নত নীতি প্রণয়নে এবং সামাজিক জনকল্যাণ প্রকল্পের প্রকৃত সুবিধাভোগী কাদের হওয়া উচিত তা নির্ধারণে বিজেপি সরকার ব্যবহার করতে চায়। নীতি আয়োগ ইঙ্গিত দিয়েছে যে ২০১১ সালের জনগণনা এরকম একটি উৎস।

বার্ষিক ৮-১০ শতাংশ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি আর নীতি সংস্কারের মাধ্যমেই দারিদ্র্য নির্মূল করা সম্ভব বলে মনে করেন অর্থমন্ত্রী। যতক্ষণ না বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৮-১০ শতাংশ পূরণ করা যাচ্ছে ততক্ষণ বেকারদের বেশিমাত্রায় কর্মসংস্থান সম্ভব নয়। এই কারণেই সরকার বিনিয়োগ বাড়াতে চায়। কার্যকরী উপায়ে দ্রুত সামাজিক বঞ্চনা নির্মূল করতে একটি স্থায়ী, সংগঠিত ক্ষেত্রে আর ভালো মাইনের স্থায়ী কাজই দারিদ্র্যদূরীকরণের সব চেয়ে ভাল পথ।■

বিপন্ন হিন্দু নারী

অনসূয়া চন্দ্র

সম্প্রতি একটি জনপ্রিয় সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে কুরুচিকর ও অশালীন একটি 'পেজ' চোখে পড়ল— 'হিন্দু গার্লস মুসলিম মর্দো কী গুলাম'। আজকের দিনে তথাকথিত শিক্ষিত মুসলমান যুবকরা এই 'পেজ'টি তৈরি করেছে। এটা অবশ্য প্রথম নয়। এর আগেও 'হিন্দু হাউজওয়াইভস্' নামে ওই সোশ্যাল সাইটে এ ধরনের একটি পর্নোগ্রাফিক পেজ তৈরি করা হয়েছিল। হিন্দু যুবক-যুবতীরা আমেরিকার ওই সংস্থার কাছে অভিযোগ জানানোয় অশ্লীলতার দায়ে সংস্থাটি ওই 'পেজ'টিকে বন্ধ করে দেয়। তাতে অবশ্য হিন্দুবিদ্বেষী মুসলমানদের দমানো যায়নি। একটি পেজ

প্রেম-প্রতারণার শিকার জাতীয় ক্রীড়াবিদ তারা সহদেব।

বন্ধ হলেও তারা অন্য নামে 'পেজ' তৈরি করে ফেলছে। এতে হতবাক হওয়ার মতো কোনো কারণ নেই। হিন্দু নারী সম্পর্কে কী ধারণা তারা পোষণ করে সেই মনোভাবেরই নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ এটা— যা তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। কারণ হিন্দুরা তাদের কাছে কাফের এবং কাফের স্ত্রীলোকের অবমাননা নিঃসন্দেহে জিহাদি ভাবনার একটা অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়।

কোরানে বিধর্মী নারীর উপর মুসলমান পুরুষদের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। যুগে যুগে এই জিহাদ নানারূপ ধরে অন্য ধর্মের মেয়েদের ওপর অভিশাপের আকারে নেমে এসেছে। বিশ্বের যে সব দেশে ইদানীং ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনগুলি আধিপত্য স্থাপন করেছে সেখানে অন্য ধর্মের মেয়েদের উপর তারা অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে। উদাহরণ হিসাবে ইয়েজিদি মেয়েদের কথা বলা যায়। ভারতের মতো দেশে হিন্দু নারীরাও তাদের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না।

প্রেমের নামে মুসলমান যুবকরা হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ মেয়েদের সঙ্গে কীভাবে প্রতারণা করে তার বেশ কিছু বিবরণ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়। ভারতে এই ধরনের ঘটনা সব থেকে বেশি ঘটেছে কেরালায়। ২০০৭ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে কেরালায় প্রায় ১১,০০০ মেয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, যার মধ্যে আজ পর্যন্ত ১,৬০০ জনের কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি। এদের মধ্যে অনেকেই প্রেম-প্রতারণা (Love Jihad)-র শিকার হয়েছিল বলে তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও সহপাঠীদের অনুমান। সাংবাদিকরা বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান থেকে জানতে পেরেছেন যে, শহুরে শিক্ষিত মুসলমান যুবকরা প্রথমে গ্রাম বা মফস্‌সল থেকে শহরের হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করতে আসা মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আরো প্রগাঢ় করে তোলে। তারপর বন্ধুত্ব পরিণত হয় প্রেমে। তারপর মেয়েগুলিকে বিয়ে করে ধর্মান্তরিত করে। অনেক সময় মেয়েগুলি উপসাগরীয় দেশে পাচার হয়ে যায়। তাদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। কোঝিকোড় ল' কলেজের যুবক জাহাঙ্গীর রজ্জাকের নাম এ প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে। সে একাই প্রেমের নামে ৪২ জন ভিন্‌ধর্মী মেয়ের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। সেই প্রতারিত ধর্মান্তরিত মেয়েগুলিকে কতখানি অমানুষিক অত্যাচার ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতেও এই ধরনের ঘটনা অনেক ঘটেছে।

কোনো কোনো মুসলমান বুদ্ধিজীবী প্রশ্ন তুলেছেন যে, হিন্দু মেয়েরাই বা কেন মুসলমানদের প্রেমের ফাঁদে পা দেয়? তাঁরা কৌশলে হিন্দু মেয়েদের উপরেই দায়টা চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন। এখানে জানাতে চাই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমান যুবকরা তাদের প্রকৃত নাম বা পরিচয় হিন্দু মেয়েদের কাছে গোপন রাখে। নাম ভাঁড়িয়ে মেয়েটির সঙ্গে যদি কোনো ছেলে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করে তবে তার দোষটা কার উপর বর্তাবে? সেই সরল সাদাসিধে মেয়েটির উপর নাকি সেই প্রতারক ছেলেটির উপর? আবার কিছু মুসলমান যুবক নাম না ভাঁড়ালেও প্রথমে মেয়েটির সামনে এমন হাবভাব দেখায় যে, সে খুবই উদার ও প্রগতিশীল। ধর্ম তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না। এমনকী মেয়েটির কাছে এমন মিথ্যা প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয় যে, বিয়ের পরেও মেয়েটি হিন্দু ধর্মীয় আচার-আচারণ পালন করতে পারবে। এর পরেও কি মুসলমানরা যাবতীয় দায় হিন্দু মেয়েটির উপর চাপিয়ে দিতে পারে?

দক্ষিণ ভারতের পাশাপাশি উত্তর, পূর্ব এবং পশ্চিম ভারতেও বহু হিন্দু মেয়ে এমন অভিনব প্রেম প্রতারণার শিকার হয়েছে। ২০১৪ সালে উত্তরপ্রদেশের সমবলে এক হিন্দু তরুণী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন যে, তার মুসলমান স্বামী নিজের প্রকৃত ধর্মীয় পরিচয় গোপন করে তাকে বিয়ে করেছিল। পুলিশ ওই যুবকটিকে গ্রেপ্তার করে। ঝাড়খণ্ডে এক মহিলা খেলোয়াড় তারা সহদেবের জীবনেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। প্রশ্ন হলো, শহরের ঘটনাগুলি তো তবুও সংবাদপত্রের শিরোনামে আসে। কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যে ঘটনাগুলি ঘটে তার কতগুলির কথা আমরা জানতে পারি?

সূত্র মারফত জানা যায়, অনেক সময় মোবাইলের দোকানের মুসলমান মালিক বা কর্মচারীরা তাদের কাছে 'ইজি রিচার্জ' করাতে আসা হিন্দু মেয়েদের ফোন নম্বর আলাদাভাবে নিজেদের কাছে রেখে দেয়। তারপর বিভিন্ন মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনের কাছে অর্থের বিনিময়ে সেই ফোন নম্বরগুলি বিক্রি করে দেয়। এবার ওই সংগঠনের যুবক কর্মীরা প্রথমে 'রং নম্বর'-এর অছিলায় ওই মেয়েগুলিকে ফোন করতে থাকে। এভাবে মেয়েগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব ও নকল প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করে। তারপর বিয়ে করে ধর্মান্তরিত করতে পারলেই কেল্লাফতে। মোবাইলের দোকানে এভাবে যত হিন্দু কিশোরী বা তরুণী ক্রেতা আসে তাদের অন্তত ৫ শতাংশকেও যদি এভাবে প্রতারণার ফাঁদে ফেলতে পারে তবে সেটাকে তারা সংগঠনের জয় হিসাবে গণ্য করে। মহারাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট সংবাদপত্রের দাবি— এভাবে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন এমনকী খৃষ্টান মেয়েদের ধর্মান্তরিত করার পুরস্কার হিসাবে মুসলমান যুবকদের প্রায় দেড় লক্ষ থেকে সাত লক্ষ টাকা দেওয়া হয়।

এবার আমরা তথাকথিত শিক্ষিত, অভিজাত, সংস্কৃতিবান, উদার মুসলমানদের দিকে চোখ ফেরাই। হিন্দি ছবির বহু মুসলমান অভিনেতার কথা আমরা জানি। তাদের স্ত্রীরাও বিয়ের সময় ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। শর্মিলা ঠাকুর হয়েছিলেন আয়েষা সুলতানা। সঙ্গীতা বিজলানীর নাম হয়েছিল আয়েষা আজহার। দিব্যা ভারতীর নাম হয় সনা নাদিয়াদবালা। অভিনেতা জায়েদ খানের স্ত্রী মালাইকা পারেখা-ও নিকাহ-র পূর্বে ধর্মান্তরিত হয়েছেন শোনা যায়। অভিনেতা সলমন খান, যিনি নিজের বাড়িতে মহাসমারোহে গণেশ পূজা করেন, তাঁর সৎমা-ও বিবাহের আগে হিন্দুই ছিলেন। সালমা খানের বিয়ের আগে নাম ছিল সুশীলা। করিনা কপূর নাকি ধর্ম পরিবর্তন করেননি বলে দাবি করছেন। কিন্তু তাঁর বোরখা পরিহিত ছবি, নিকাহের আগে কলমা পরা এবং নামের শেষে ব্যবহৃত খান পদবি তো অন্য ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই তালিকায় নবতম সংযোজন হলেন দক্ষিণ ভারতের অভিনেত্রী মণিকা যিনি ২০১৪ সালে ধর্ম পরিবর্তন করে হয়েছেন রহিমা। শাহরুখ খান নিজের বাড়িতে দীপাবলি উৎসব পালন করেন। তাঁর স্ত্রী গৌরী নাকি ধর্ম পরিবর্তন করেননি। অথচ এই শাহরুখই আমেরিকা থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় নিজের কলমে জানিয়েছেন যে মুসলমান নাম রাখলে ভবিষ্যতে দেশে তাঁর ছেলে-মেয়েরা বর্ণবৈষম্যের শিকার হতে পারে ভেবেই নাকি তিনি তাদের আরিয়ান ও সুহানা জাতীয় 'প্যান-ইন্ডিয়ান' নাম রেখেছেন। এবার তো সন্দেহ জাগতেই পারে যে, শাহরুখ নিজেকে যতটা ধর্মনিরপেক্ষ দেখাবার চেষ্টা করেন সেটা কতটা সত্য আর কতটা সাজানো? শাহরুখপত্নী গৌরী হয়তো এবার ধর্মান্তরিত হতে পারেন। এতে বিচিত্র কিছু নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হৃতিক রোশনের সদ্য প্রাক্তন স্ত্রী সুজান খান অথবা মুমতাজ (যিনি একজন প্রবাসী হিন্দু ব্যবসায়ীকে বিয়ে করেছিলেন) ধর্মান্তরিত হননি।

প্রেম-প্রতারণা ছেড়ে এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। যেখানে 'শিকার'কে প্রেমের ফাঁদে ফেলা যাচ্ছে না সেখানে তাকে বলপূর্বক অপহরণ করে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। ২০১৪ সালে উত্তরপ্রদেশের মীরাটে অপহৃত এক তরুণী এই অভিযোগ করেছিলেন। ২০ বছরের ওই তরুণীকে অপহরণ করে একটি মাদ্রাসার মাটির নীচের ঘরে আরো ৪০ জন মেয়ের সঙ্গে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। দিনের পর দিন ওই মাদ্রাসার শিক্ষক ও তার পরিবারের সদস্যরা মেয়েগুলির উপর সর্বপ্রকারের নিপীড়ন চালাত। তারপর পূর্বোক্ত তরুণীকে বিয়ে করে তাকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়। কোনোরকমে মুক্তি পাওয়া মেয়েটির অভিযোগের ভিত্তিতে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হয়। উত্তরপ্রদেশেরই এমন একটি নির্যাতিতা মেয়ের ভিডিও বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ছড়িয়ে পড়েছিল যে ভিডিওতে মেয়েটি জানিয়েছে মুসলমানরা তার উপর অত্যাচার করার সময় বলেছিল যেহেতু সে মূর্তিপূজা করে তাই তার ওইরকম শাস্তিই প্রাপ্য। ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে মুসলমানদের যেমন নামাজ পড়ার অধিকার আছে তেমন হিন্দুদেরও মূর্তিপূজা করার অধিকার থাকবে। সেখানে কীভাবে মুসলমানরা মূর্তিপূজা করার অপরাধে কোনো নারীর নারীত্বের চরম অবমাননা করতে পারে?

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মুসলমানরা এভাবে হিন্দু নারীদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। এর শীর্ষে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। গত ২০১৩ সালে কামদুনির নিহত মেয়েটির প্রসঙ্গ বারবার বিভিন্ন আলোচনায় উঠে এসেছে। সেক্ষেত্রে প্রধান অপরাধী ছিল একজন মুসলমান। কেন ঘটনার দুই বছর পরেও তার বিচার করা গেল না? মুসলমানরা ক্ষুণ্ণ হবে সেই জন্য? ২০১৪ সালের মে মাসে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন গ্রামে মুসলমানরা হিন্দু নারীদের সম্মানহানি করেছে, তাদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর করেছে, অনেক বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির হালও খুব ভাল নয়। অথচ বহু ক্ষেত্রেই সংখ্যালঘু বলে মুসলমানরা ছাড় পেয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। কামদুনির নৃশংস ঘটনাটির কিছুদিন পরে বারাসাতের এক গ্রামে একটি ৭ বছরের মুসলমান কন্যাশিশু তার প্রতিবেশী এক ৫২ বছরের প্রৌঢ়ের অত্যাচারের শিকার হয়। শিশুটি একটি স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল। প্রৌঢ়ের অভিযোগ, শিশুটি নাকি স্কুলে ও পরিবারে প্রয়োজনীয় 'ইসলামিক' শিক্ষা লাভ করছিল না। শিশুটি বিভিন্ন ধরনের ছবি সংগ্রহ করে বেড়াত। এর মধ্যে নানা ধরনের পশু ও পাখির ছবি যেমন ছিল তেমনই ছিল বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর ছবি। এত বড় ধর্মবিরোধী কাজ যে করেছে তার তো এমন নৃশংস শাস্তিই প্রাপ্য, তাই না? একটি মুসলিম শিশুর সঙ্গে যদি দেবদেবীর ছবি রাখার অপরাধে এমন অমানবিক আচরণ করা যায়, তাহলে মুসলমানরা মূর্তিপূজক হিন্দুদের সঙ্গে যে কী কী করতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এ প্রসঙ্গে আরো স্মরণ করা উচিত, ২০১৪ সালে সমাজবাদী পার্টির মুসলিম নেতা আবু আজমি বলেছিলেন, মেয়েরাই নাকি যত নষ্টের গোড়া। যেসব মেয়েদের জীবনের এ ধরনের ঘটনা ঘটে তারা নিজেরাই এজন্য দায়ী। অতএব সবার আগে তাদেরই শাস্তি দিতে হবে। নির্ভয়া বা অপরাজিতা মুসলমান হলেও কি আজমি এই কথাই বলতেন?

দেশের প্রধানমন্ত্রী বলছেন, 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও।' কিন্তু সবার আগে তো নিরাপত্তা ও সম্মান। ধর্মান্ধ মুসলমানদের হাতে স্কুল-কলেজে পড়তে যাওয়া মেয়েরা যদি এই ভাবে প্রতারণা ও অত্যাচারের শিকার হতে থাকে তবে তারা বাঁচবেই বা কীভাবে আর পড়বেই বা কীভাবে? এ হিন্দু সমাজের কলঙ্ক। এ কলঙ্কমোচনে হিন্দু যুবক-যুবতী সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। ■

বিধর্মী আগ্রাসনের শিকার হিন্দু নারী

রিনি রায়

ইসলাম অনুসারে 'জিহাদ' একটি পবিত্র কর্তব্য। অমুসলমান দেশগুলিতে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে সপ্তম শতাব্দী থেকে তরবারির প্রচলন থাকলেও বিংশ, একবিংশ শতাব্দীতে এসে এ পুরাতন কৌশল কিছুটা বদলে গেছে। জিহাদের দ্বারা জান্নাতের সুখ সম্ভাবনাকে পাকা করতে 'সাচ্চা মুমিন'-রা এখন ভালোবাসা নামক এক মানসিক অনুভূতিকে ইসলাম প্রসারের কৌশল হিসাবে ব্যবহার করছে। আর এই কৌশলের অঙ্গরূপে প্রলোভনের বিষয়বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কাফের নারীগণ। এর কারণ হিন্দু জাতির শ্রদ্ধার মানবিন্দু যেহেতু নারী, সেহেতু জাতির মানবিন্দুকে ভেঙে দিতে পারলেই বিনা যুদ্ধে অধিকার করা যাবে দেশ।

বহু শতাব্দী পেরিয়ে আজও ভারতীয় সমাজ বিভিন্ন পথে, বিভিন্নভাবে ইসলামি আগ্রাসনের শিকার। ভারতীয় জনসংখ্যার চরিত্রকে সুকৌশলে, স্থায়ীভাবে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে মুসলমানরা 'টার্গেট' করছে হিন্দু মহিলাদের। কোথাও ভালোবাসার ফাঁদে ফেলে, কোথাও বা জোর করে ও ভয় দেখিয়ে ধর্মান্তরকরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এরা।

হিন্দু মেয়েদের ফাঁদে ফেলতে তারা হাতিয়ার করছে 'লাভ জিহাদ' নায়ক অস্ত্রটির। এই শব্দ যুগল প্রথম শোনা গিয়েছিল ২০০৯ সালে কেরলের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত পাথানামথিট্টা জেলায় ঘটে যাওয়া একটি বিবাহ-কে ঘিরে। ওই বছরই কেরল হাইকোর্টের বিচারপতি কে টি শঙ্করন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জানান, "an alleged Muslim plot to forcefully convert young Hindu girls to Islam by having Muslim boys entrap them in love affairs." এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে কেরলে সরকারকে 'deceptive 'acts of L J' (Love Jihad) নিষিদ্ধকরণে আইন তৈরির আদেশ দিয়েছিলেন। ২০০৯ এর পর থেকেই লাভ জিহাদের প্রবণতা ভারতের উত্তরাংশে বিশেষত উত্তরপ্রদেশ, অসম, ঝাড়খণ্ড এবং সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে শহর-গ্রাম মিলিয়ে এমন বহু মুসলমান পরিবার আছে যেখানে বাড়ির কোনো না কোনো বউ হিন্দু এবং অনুসন্ধানের গভীরতা একটু বাড়ালেই দেখা যাবে প্রতিটা ক্ষেত্রেই এরা লাভ জিহাদের শিকার। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তেই মেয়েদের আলাপ হয় রকি, মুন্না, পাপ্পু, বুড়ো, বাপি বা কোনোও সুন্দর হিন্দু নামের স্মার্ট মুসলমান যুবকদের সঙ্গে। কিছুদিন পর সেই আলাপ গড়ায় প্রেমে। তারপর বিবাহে। চেন্নাই এর একটি এন জি ও 'দ্য ভয়েস ফর জাস্টিস' পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে যে এইরকমের ভালোবাসার সম্পর্ক প্রথমে শুধু হয় এস এম এস প্রেরণ, ক্রমে মিসড্ কল, ফোনের মাধ্যমে এবং পরে মুসলমান ছেলেদের কাছ থেকে এমন ভালোবাসা পাওয়া যায়, যেন তা অকৃত্রিম, খাঁটি। কিন্তু কোরানের ২.২১ সুরা অনুসারে যেহেতু তাদের পক্ষে কোনো মুশহেক অর্থাৎ ইসলামে অবিশ্বাসী নারীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ, তাই মেয়েগুলিকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়। আর তখনই স্বপ্নভঙ্গ ঘটে হিন্দু মেয়েদের। এ তালিকায় নামি দামি তারকা থেকে শুরু করে অতি সাধারণ ঘরের মেয়েরাও আছে।

ইমরান খান-জেমিনা খান, নবাব মনসুর আলি খান-বেগম আয়েশা সুলতানা (শর্মিলা ঠাকুর), সইফ আলি খান-অমৃতা সিং ও কারিনা কাপুর খান 'লাভ জেহাদ'-এর শিকার হলেও নির্মমভাবে স্বপ্নভঙ্গের সম্মুখীন হয়তো এরা হননি কিন্তু এদের অনুসরণ করে সাধারণ ঘরের মেয়েদের জীবনের চরম সর্বনাশ ঘটছে। কপালে জুটছে ধর্মান্তরকরণ, অকথ্য শারীরিক নির্যাতন, কোথাও বা আবার পতিতাপল্লীতে বিক্রি হওয়ার অভিশাপ। এখানেই নির্যাতন থেমে থাকে না। কোথাও কোথাও স্বামী ব্যতীত শ্বশুর বা পরিবারের অন্য পুরুষ সদস্যের দ্বারাও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিতা হতে হয়। যেমনটা ঘটেছিল কোচবিহার জেলার পশ্চিমঘাটের বাসিন্দা সহদেব কুণ্ডুর কন্যা বেণুপ্রিয়ার ক্ষেত্রে।

'লাভ জিহাদ'-এর অসংখ্য উদাহরণের মাঝে সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়- জাঁবাজ খান, তারা সহদেব-রাকিবুল হাসান (হিন্দু ছদ্মনাম

রঞ্জিত কুমার কোহলি), রুমি নাথ-এর ঘটনাগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এর ঘৃণ্য রূপটি। কেরল থেকে প্রকাশিত 'জন্মভূমি' পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে প্রেম জিহাদের সঙ্গে জড়িত জিহাদি রোমিওরা যত বেশি সংখ্যক মেয়েদের প্রেমের জালে ফাঁসাতে পারবে, সেই অনুযায়ী বিশেষ পদমর্যাদা, পুরস্কার ও অর্থ দেওয়া হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কিশোরী বা সদ্য কৈশোর পেরোনো মেয়েগুলোকে ভালোবাসার রঙিন স্বপ্নে বিভোর করতে, দামি উপহার দিয়ে মন ভেজাতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন বা নিজেদের চটকদারি দেখানোর জন্য যে বাইক, দামি জামা, সানগ্লাসের প্রয়োজন সেগুলিও বিশেষ বিশেষ (ইসলাম প্রভাবিত) সংস্থা থেকে জোগান দেওয়া হয়। কেরল পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রতিবেদন অনুসারে ১৯৯৬ সাল থেকেই ইসলামি মৌলবাদী সংগঠনগুলি যেমন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) এবং পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ার 'ক্যাম্পাস ফ্রন্ট'-এর শিকড় কেরলের বেশিরভাগ কলেজ ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে রয়েছে সম্পন্ন ঘরের হিন্দু-খৃষ্টান কলেজ পড়ুয়া মেয়েদের ফাঁদে ফেলার জন্য। এরকমই এক রোমিও জিহাদি জাহাঙ্গির রজাক, যে বিয়াল্লিশেরও অধিক হিন্দু তরুণীকে ছদ্ম প্রেমের জালে ফাঁসিয়েছে। এমনকী সে সন্ত্রাসবাদ ও মধুচক্রের সঙ্গেও যুক্ত। সর্বশেষ প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুসারে ২০০৬ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে শুধুমাত্র কেরলে ২৬৬ জন তরুণীর ধর্মান্তরকরণের খবর পাওয়া গেছে। ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে কর্ণাটক সরকার উদুপী এবং দক্ষিণ কর্ণাটক থেকে ৮৪ জন হিন্দু মেয়ের নিরুদ্দেশের ঘটনা তদন্ত করার পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিল। এক্ষেত্রে সন্দেহ করা হয়েছিল যে এই মেয়েগুলোর সঙ্গে লাভ জিহাদর পরিণতি ঘটেছে। অসমের কংগ্রেস এমএলএ রুমিনাথ যিনি একজন বিবাহিত এবং এক সন্তানের জননী তিনিও ফেসবুকে একজন বাংলাদেশি মুসলমান যুবকের প্রেমে পড়ে ঘর ছেড়েছিলেন। পরিণতি সেই বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের চাপ, শারীরিক অত্যাচার।

মারাঠি লেখিকা সুনীলা শোভানির লেখা 'লাভ জিহাদ, মিউটেড হরর' গ্রন্থটি সকল হিন্দু নারীর অবশ্য-পঠনীয় একটি গ্রন্থ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। কেতন রঙ্গ তাঁর 'মিড ডে' রচনায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন "Yong Muslim boys are trained to make Hindu or Christian girls fall in love with them (in a time span of two weeks) and then convert them to Islam in six months. If the recruits can't make the girl fall in love in two weeks, they are told to move on to the next target." মুম্বই-য়ের এক দৈনিক পত্রিকায় ২০০৯-এর ৩০ অক্টোবর শ্রীরঙ্গ তাঁর অপর এক প্রতিবেদন "লাভ জিহাদস বেবি মেশিন'-এ প্রেম জিহাদের কুফল সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করেন। যে সকল অমুসলমান মেয়েরা প্রেমের ফাঁদে পড়ে মুসলমান যুবকদের সন্তান গর্ভে ধারণ করে, জন্মদানের পর তাদের ও সন্তানদের মগজধোলাই করে আত্মঘাতী মানব বোমায় পরিণত করে মা কোনো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থে কাজ লাগায়, এমনকী যৌন ব্যবসার জন্য সৌদি আরবে পাচার করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ

নারী নিপীড়নে পশ্চিমবঙ্গের তালিকাও দীর্ঘ

পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদে একজন মহিলা আসীন হলেও সামগ্রিকভাবে এই বঙ্গ মহিলাদের জন্য সুরক্ষিত নয়। সম্প্রতি ন্যাশানাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে শ্লীলতাহানি, গার্হস্থ্য হিংসা, অপহরণ, মানব পাচারের ক্ষেত্রে প্রথম পাঁচের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। ২০১৪ সালে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে সর্বমোট ৩৮,৪৬৭টি কেস রজু হয়েছে (দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ)। ধর্ষণের হার ২০১৩-এর তুলনায় নিম্নাভিমুখী হলেও নারীর উপর হওয়া অন্যান্য অত্যাচারের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান অধিকার করে রেখেছে পশ্চিমবঙ্গ। ২০১৪-তে ধর্ষণের অভিযোগ জমা পড়েছে ৯৪৬৬টি। মনে রাখতে হবে, গ্রামেগঞ্জে এমনও বহু মহিলা আছেন, যাঁরা লোকলজ্জার ভয়ে পুলিশের কাছে যেতে ভয় পান। এন সি আর বি-র দেওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে, নথিবদ্ধ হওয়া ১৪৬৬টি ধর্ষণ ঘটনার মধ্যে মাত্র ৬০২টি কেসে ধর্ষিতা ধর্ষকের পূর্বপরিচিত। স্বামী বা শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়দের দ্বারা নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ২৩,২৭৮টি, যা দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। অপরহরণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সর্বোচ্চ তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। রজু হওয়া কেসের সংখ্যা ৫০৬২। এছাড়া ৬৮৭ জন মহিলাকে বিবস্ত্র করে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। এককভাবে কলকাতায় লিখিত ভাবে আই পি সি ধারায় কেসের সংখ্যা ২, ১৩,০২৪টি। এছাড়াও হত্যার চেষ্টা ৭২৪৮, ধর্ষণের চেষ্টা ১৬৫৬, পাচার ২০৫। দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কেস নথিভুক্ত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গেই।

দুষ্কর্মের পরিসংখ্যান

শহরের নাম	আদালতগ্রাহ্য অপরাধসমূহ	খুন	খুনের প্রচেষ্টা	ধর্ষণ
বেঙ্গালুরু	৩১,৮৯২	২৪১	৪৮৯	১০৪
চেন্নাই	১৬,৮৬১	১৬১	১০১	৬৫
দিল্লী	১,৩৯,৭০৭	৪৭২	৬৭৫	১৮১৩
মুম্বই	৪০,৩৬১	১৮৩	১৮১	৬০৭
কলকাতা	২৬,৬২১	৭৪	১০১	৩৬

শতাংশের হিসাবে ভারতে সংঘটিত অপরাধসমূহ

বেঙ্গালুরু	চেন্নাই	দিল্লী	মুম্বই	কলকাতা
৫.২	২.৭	১২.৭	৬.৫	৪.২

বলা যায় পাটনায় নরেন্দ্র মোদীর সমাবেশে যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল তার সূত্র ধরে আয়েশা নামে যে মেয়েটি গ্রেপ্তার হয়েছিল, সেই মেয়েটি আদতে ছিল ম্যাঙ্গালুরুর এক হিন্দু পরিবারের সন্তান। এক মুসলমান ছেলেকে ভালোবেসে সে ধর্মান্তরিত হয়েছিল।

ভারতীয় নারীদের কুলধর্ম বিনাশের জন্য যে সবসময় প্রেমের ছলচাতুরিকেই মুমিন যুবকরা অস্ত্র হিসাবে কাজ করে তা নয়। ভালোবাসার মধুতে যদি কোনো মেয়ে রাজি না হয় তখন তারা অপহরণ, ধর্ষণের পথে পা বাড়ায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্ষণের ছবি বা শারীরিক সম্পর্কে স্থাপনের ছবি ক্যামেরায় তুলে রেখে পরবর্তীকালে মুসলমান যুবকগণ ব্ল্যাকমেলিং-এর কাজে লাগায়। উদাহরণস্বরূপ মিরাটের এক শিক্ষিকার দুর্দশার কথা এ প্রসঙ্গে উত্থাপন করা যেতেই পারে। গতবছর মিরাটের ওই শিক্ষিকাকে একটি মাদ্রাসার ভিতর গণধর্ষণ ও গোমাংস খাইয়ে অকথ্য অত্যাচার করে একজন মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। এ বছরই দিল্লীর একটি দৈনিক পত্রিকা ‘পাঞ্জাব কেশরী’-তে প্রকাশিত হয়েছিল অঞ্জু (নাম পরিবর্তিত) নামে এক বিবাহিতা মহিলার কথা। তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে মুসলমান বাড়িওয়ালা দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছিল সে। যতই বলা যাক না কেন এ তালিকা কম দীর্ঘ হবে না। মিরাটেরই সৈনিক বিহারে ১৬ বছরের এক কিশোরীকে গণধর্ষণ করা হয়েছিল। এইরকম ব্যাপার শুধু যে মিরাটে ঘটেছে তা নয়। সমগ্র ভারতেই এইরকম ঘটছে।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গেই গত চার-পাঁচ বছরে যত ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, আর যতগুলি মিডিয়ার আলোয় এসেছে, সেগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ধর্ষকরা মুসলমান। পার্কস্ট্রিট, ডায়মণ্ড-হারবার, কালচিনি, বারাসাত, রামপুরহাট, ডানকুনি, কাশীপুর, বর্ধমান, কাকদ্বীপ, কালিয়াদহ, খানাকুল, ঘাটাল, মধ্যমগ্রাম, আউশগ্রাম, গাজল, গেদে, কামদুনি, ব্যারাকপুর, ভাঙ্গড়, গোঘাট, চাঁপাদানি, পুরশুড়া, কান্দী, খরজুন, মুর্শিদাবাদের

পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যে সংঘটিত অপরাধসমূহের তুলনামূলক পরিসংখ্যানের তালিকা

ধর্ষণ

মধ্যপ্রদেশ	—	৫.০৭৬
রাজস্থান	—	৩,৭৫৯
উত্তরপ্রদেশ	—	৩,৪৬৭
মহারাষ্ট্র	—	৩,৪৩৮
পশ্চিমবঙ্গ	—	২,৪৬৬

ধর্ষণের প্রচেষ্টা

পশ্চিমবঙ্গ	—	১,৬৫৬
রাজস্থান	—	৩৭৩
উত্তরপ্রদেশ	—	৩২৪
মধ্যপ্রদেশ	—	৫৬
মহারাষ্ট্র	—	১৫

সূত্র : এন সি আর বি।

হরিহরপাড়া, খিদিরপুর, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন, নারকেলডাঙা প্রতিটি জায়গায় সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সম্প্রতি মগরাহাটের কিশোরী টুকটুকি মণ্ডলের সঙ্গে যা ঘটে গেল তা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের পক্ষে মুসলমানদের (রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে) ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি বললে অত্যুক্তি করা হবে না। ১৪ বছরের এই কিশোরীকে দু'দফায় বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেলিম তার ডেরায় বন্দী করে রাখে। কিছুদিন পরে যখন বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, রাজনৈতিক দল, পুলিশ, প্রশাসনের চাপে পড়ে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়, তখন ওই ছোট মেয়েটিকে ভয় দেখিয়ে পুলিশের সামনে মিথ্যা বয়ান দিতে বাধ্য করে। ছোট টুকটুকি বাধ্য হয়ে ঘর ছাড়া হওয়ার ব্যাপারে বাবা মাকেই শেষে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

লাভ জেহাদের মোকাবিলা শুধুমাত্র আইন ও প্রশাসন দিয়ে হবে না। এরজন্য ব্যাপক জনসচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে। লাভ জিহাদের প্রবক্তারা ছাড়াও বহু সংস্থা এবং মানুষ আছেন যারা এই ভয়ঙ্কর দিকটি সম্পর্কে মানুষকে বিভ্রান্ত করে লাভ জেহাদকেই সহায়তা করেন। আজকের পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদের অন্যতম রসদের যোগানদার এই লাভ জিহাদ। স্বাভাবিকভাবে এর বিরুদ্ধে সঠিক ধারণা এবং তথ্য-সহযোগে মানুষকে জানানোর এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সর্বস্তরে একটি সুসংহত আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

চিঠিপত্র

না চেনার মাশুল

'নেহরুর মুসলমান তোষণ নীতির ফল আজও ভারতবাসীকে ভুগতে হচ্ছে কাশ্মীরে'— গূঢ়পুরুষের কলমে (স্বস্তিকা ১৩ জুলাই ১৫) প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা।

একজন ভারতীয় একজন বৃটিশের বিরুদ্ধে বৃটিশ বিচারকের কাছে বিচার চাইলে বিচারের যে পরিণতি হয়, লক্ষ লক্ষ হিন্দু নিধন করে ভারত ভাগ করে পাকিস্তান ছিনিয়ে নেওয়া জিন্নার কাছে হিন্দু-ভারতের শ্রীবৃদ্ধির আশা করলে যে পরিণাম লাভ করার কথা, জহরলাল ও তার পরিবারের হাতে ভারতের শ্রীবৃদ্ধির গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে ভারতবাসী সেই প্রকার পরিণাম লাভ করেছে।

ইন্টারনেটে প্রকাশিত 'এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইনডিপেন্ডেন্স' সূত্র থেকে প্রকাশিত তথ্যে জানা যায় যে নেহরু বংশের গঙ্গাধর নেহরু আসলে ছিলেন একজন মুসলমান যার নাম ছিল গিয়াসউদ্দিন গাজি (উল্লেখ্য, কাফের হত্যা করলে 'গাজি' উপাধি লাভ করা যায়)। বৃটিশ যখন দিল্লী দখল করেছিল তখন কোনো মোগল (ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু) যেন জীবিত না থাকতে পারে তার জন্য খুঁজে খুঁজে সব মোগল হত্যা করছিল। তখন গিয়াসউদ্দিন গাজি বাঁচার জন্য গঙ্গাধর নাম গ্রহণ করে। তারই বংশধর জহরলাল নেহরু--- নেতাজী এবং শ্যামাপ্রসাদের বৃহত্তম শত্রু। ইনি দেশভাগ মেনে নিয়ে মুসলমানদের দান করেছিলেন সেই জন্যই। হিন্দুর ছদ্মবেশে কোনো মুসলমান যদি হিন্দুস্থানের উচ্চতম কর্ণধার হন তার পক্ষে শুধু কাশ্মীর কেন সারা দেশের কোনো উন্নতি করা সম্ভব নয়। কারণ তিনি গিয়াসউদ্দিন গাজির বংশগত প্রতিনিধি। ড. স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ নেহরুর একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন, ''বাই এডুকেশন আই অ্যাম অ্যান ইংলিশম্যান, বাই ভিউ অ্যান ইন্টারন্যাশনালিস্ট, বাই কালচার অ্যা মুসলিম অ্যান্ড আই অ্যাম অ্যা হিন্দু অনলি বাই অ্যাক্সিডেন্ট অব্ বার্থ'' (সাপ্তাহিক বর্তমান ৬ জুন ১৫, পৃ. ২৫)। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানের থেকে ভারতের শ্রীবৃদ্ধির অবাস্তব সাহায্য আশা করারই নামান্তর নোয়াখালির দাঙ্গার সময়, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় জওহরলালের ভূমিকা থেকে তা বোঝা গিয়েছে। দেশবাসী তাকে ও তার পরিবারতন্ত্রকে চিনতে পারেনি এটা ভারতবাসীর সর্বনাশা দুর্ভাগ্য। ১৯৫৭ সালে কাশ্মীর প্রসঙ্গ রাষ্ট্রসঙ্ঘে তুলেছিল পাকিস্তান। মহাশক্তিধর ৫ দেশের মধ্যে ৪টি দেশ বিষয়টি ভোটের মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রস্তাব দিলে সোভিয়েত ইউনিয়ন একা ভেটো প্রস্তাবে তা খারিজ করে দেয়। তবে খাতিরে নয়, সোভিয়েত জাতির স্বার্থে। কাশ্মীর পাকিস্তানে গেলে কাশ্মীর মার্কিন ঘাঁটিতে পরিণত হোত, একেবারে শিয়রে সমন উপস্থিত হোত রাশিয়ার। তার পরেপরেই সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রী এবং ১৯৬৪ সালে সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি ক্রুশ্চেভ কাশ্মীর সমস্যার বাস্তোবচিত সমাধানের পথ বাতলে নেহরুকে চিঠি লেখেন। নেহরু তা কানেও তোলেননি। যে সকল বিষ সে সময় দেশভাগ করেছিল, লক্ষ লক্ষ প্রাণহানি ঘটিয়েছিল তার সবগুলির বীজ রেখে গেছেন নেহরু ও তার বংশধররা। যা কিছু একজাতি, এক-সংবিধান বিরোধী তা সবই স্থাপন করে গিয়েছেন ওই নেহরু, তাঁর পরিবার ও তাঁর দল। তারই ফল ভারতবাসী ভুগছে, এবং ভুগবে সম্ভবত আর একটি মহা-সর্বনাশ না হওয়া পর্যন্ত। শত্রুকে চিনতে এবং তাকে দমন করার পথ তৈরি করে না যে জাতি, সেই জাতির বিপন্ন হওয়া থেকে আর কেউ বাঁচাবে না; সে ব্যবস্থা করতে হবে স্বয়ং সেই জাতিকেই।

—**অনির্বাণ সেনগুপ্ত,**
বগুলা, নদীয়া।

আস্তে কয়েন কত্তা গোরায় হাসব

গত বৃহস্পতিবার সংসদের বাদল অধিবেশন শেষ হলো। শেষ হলো না বলে পণ্ড হলো বলাই বরং ভালো। কেননা অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকে বিরোধীদের বিশেষ করে কংগ্রেসের লাগাতার বিরোধিতার জন্য প্রতিদিনই অধিবেন মুলতুবি ঘোষণা করতে হয়েছে।

গণতন্ত্রে বিরোধীরা সরকারের সমালোচনা করবে, বিরোধিতা করবে এবং প্রয়োজনে সভা থেকে ওয়াকআউটও করবে— এটা কোনো দোষের নয়, বরং গণতান্ত্রিক রীতি। এতে গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হয়।

কিন্তু এবারের অধিবেশন বিরোধীরা বিশেষ করে কংগ্রেস যে ইস্যুকে সামনে রেখে অধিবেশন পণ্ড করার চেষ্টা করছে তা হলো— কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধীর প্রশ্ন সুষমা স্বরাজ ললিত মোদীর থেকে কত টাকা ঘুষ নিয়েছেন তা বলতে হবে এবং তিনি যে ঘুষ নিয়েছেন তার জন্য তাঁকে ইস্তফা দিতে হবে।

তাঁর এই দাবির উত্তরে বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ পালটা কিছু উপদেশ দিয়েছেন রাহুল গান্ধীকে। তিনি বলেছেন— মায়ের কাছে জানতে চান, আমরা ভোপাল গ্যাস কেলেঙ্কারির খলনায়ক, ইউনিয়ন কার্বাইডের কর্তা আন্ডারসনকে এদেশ থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে কত টাকা পেয়েছি?

সুষমাজীর উপদেশের সূত্র ধরে কংগ্রেস দলের যত মাথামুণ্ডু আছে তাঁদেরকে জানাতে চাই যে, স্বাধীনতার পর গত ৬৮ বছরের মধ্যে কংগ্রেস একাই শাসন ক্ষমতায় ছিল ৬০ বছর। এই সময়কালে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর আমলে জীপ কেলেঙ্কারি দিয়ে কংগ্রেসীদের দুর্নীতির হাতে খড়ি। তারপর একের পর এক কেলেঙ্কারি হয়েছে। সবচেয়ে মারাত্মক কেলেঙ্কারি ভূপাল গ্যাস কেলেঙ্কারি। যে কেলেঙ্কারিতে হাজার হাজার লোক মারা গিয়েছেন, হাজার

হাজার লোক পঙ্গু হয়ে দিন কাটাচ্ছেন, এমনকী ওই গ্যাসের প্রভাবে হাজার হাজার বিকলাঙ্গ শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। এছাড়া কংগ্রেসী শাসনে গত ১০ বছরে ২-জি স্পেকট্রাম এবং কয়লা ব্লক বণ্টন কেলেঙ্কারিতে রাজকোষের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ক্ষতি যারা করেছে তাদের কাছ থেকে কংগ্রেস কত কোটি টাকা নিয়েছে সেটা আগে প্রকাশ করা উচিত।

ইন্দিরা গান্ধীর আর এক কেলেঙ্কারী হলো— 'সত্তরের দশকে ইন্দিরা গান্ধীর বাড়িতে যেত সুটকেস ভর্তি টাকা। টাকা পাঠাত কেজিবি।' না, এটা আমার কথা নয়। একথা এক বৃটিশ অধ্যাপক ক্রিস্টোফার অ্যান্ড্রু এবং প্রাক্তন কেজিবি কর্মী ভ্যাসিলি মিত্রোখিন-এর। তাঁদের লেখা 'দ্য মিত্রোখিন আর্কাইভ, ভল্যুম ২ : দ্য কে জি বি অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড' নামের বইতে লিখেছেন। পড়ে দেখবেন ভাল লাগবে।

কে জি বি'র বেশ কয়েকজন প্রাক্তন কর্তা স্বীকার করেছেন, ভারতে জরুরি অবস্থার সময় ইন্দিরাকে সমর্থন করার জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকেও (সি পি আই) প্রভাবিত করে কেজিবি। ১৯৭১ এর ফেব্রুয়ারিতে ইন্দিরা গান্ধী দিল্লীর ক্ষমতা দখলের পর থেকেই তাঁকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে অনেক বেশি তৎপর হয়ে ওঠে ক্রেমলিন। সে সময় সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বময় কর্তা ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি লিওনাদ ব্রেজনেভ।

১৯.৯.০৫ তারিখের ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস কাগজে আর একটি চাঞ্চল্যকর খবর ছাপা হয়েছে— 'কে জি বি'র প্রাক্তন গোয়েন্দা ভাসিলি মিত্রোখিন এবং বৃটিশ ঐতিহাসিক ক্রিস্টোফার অ্যান্ড্রুর লেখা বিতর্কিত বইটির ৩১৩ নং পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হয়েছে— ''কেজিবি'র রিপোর্ট অনুসারে প্রয়াত অবিসংবাদী সিপিএম নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত ১৯৪৭ সাল থেকেই আইবি'র চর বা 'ইনফরমার' হিসাবে কাজ করেছিলেন।''

এখন লোকে বলাবলি করছে এবারের লোকসভার অধিবেশন পণ্ড করার কাজে ঘুষখোর প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস এবং তার লেজুড় আর এক ঘুষখোর পুরনো সঙ্গী কমিউনিস্ট ও সুবিধাবাদী দলগুলি হাতে হাত মিলিয়েছে।

তাই এই সমস্ত নেতাদেরকে পূর্ববাংলার ভাষায় বলা যায়— 'আস্তে কয়েন কত্তারা, আপনাগো কথা শুইন্যা গোরায়ও হাসব।'

—**মণীন্দ্রনাথ সাহা,**
গাজোল, মালদহ।

বন্যা নিয়ে রাজনীতি

সম্প্রতি রাজ্যে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির জন্য মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী ডিভিসি কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেছেন। কিন্তু সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের নির্দেশমতো ডি ভি সি বাঁধ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল ছেড়ে থাকে। আর জল ধারণের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে না থাকলে জল ছাড়তে বাধ্য ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া জল ছাড়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় দামোদর ভ্যালি রিজার্ভার রেগুলেশন কমিটি। যার মধ্যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সেচ দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার আছেন। তাহলে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধির অনুমতিতেই তো ডিভিসি জল ছেড়েছে। তাই পরোক্ষে এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার দায় এড়াতে পারে না। অথচ ২০০০ সালে এই তৃণমূল নেত্রীই রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতির জন্য ম্যান্ মেড্ বন্যার তত্ত্ব শুনিয়েছিলেন। আজ সেই নেত্রীই মুখ্যমন্ত্রী হয়ে সত্যটা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন। দক্ষিণবঙ্গে বিশেষ করে হুগলী, দুই মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা, বর্ধমান জেলায় বন্যার আশঙ্কা প্রতি বছরই থাকে। আসলে ভরা কোটালের জোয়ার ও অতিরিক্ত বৃষ্টি এবং সেইসঙ্গে রাজ্যের নদীগুলোর খাত বুজে যাওয়া ও জবর দখল হয়ে যাওয়াও বন্যার অন্যতম কারণ। এছাড়া দীর্ঘদিন নদীগুলোর বাঁধ মেরামতের অভাবে জলধারণ ক্ষমতা কমার কারণেই মাঝে মধ্যে তা ভেঙে গিয়েও বন্যার সৃষ্টি করেছে। এ ব্যাপারে অভিনেতা তথা তৃণমূল সাংসদ দেব মন্তব্য করেছেন রাজ্য সরকার এই বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তৈরি ছিল না। অর্থাৎ অপ্রিয় সত্যি কথাটা তিনি বলে ফেলেছেন।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সামগ্রিক পরিস্থিতির জন্য রাজ্য সরকারের ব্যর্থতাকে দায়ী করা অমূলক নয়। বরং বন্যা নিয়েও তৃণমূল নেতৃত্ব রাজনীতি করেছেন। অযথা কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেছেন। এ ব্যাপারে বামরাজত্বের মতোই তৃণমূল নেতৃত্বও রাজ্যবাসীকে ভুলবার্তা দেয়। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়কেও রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী বন্যা কবলিত মানুষের সঙ্গে পরোক্ষে প্রতারণা করেছেন বললেও অত্যুক্তি করা হয় না।

—**সমীর কুমার দাস,**
দ্বারহাট্টা, হুগলী।

উইপ্রোর কর্ণধার আজিম প্রেমজী

উইপ্রোর কর্ণধার মাননীয় আজিম প্রেমজী আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আজিম প্রেমজী আপনাকে কোটি কোটি সাধুবাদ। স্বস্তিকায় প্রকাশ (২০ জুলাই ২০১৫) আধ্যাত্মিক ও সেবা কাজের জন্য আপনি আপনার কোম্পানির ৩৯ শতাংশ অর্থ অর্থাৎ ৫৩,২৮৪ কোটি টাকা দান করতে চলেছেন। মহান কাজের জন্য এই বিপুল পরিমাণ অর্থ দান ভারতের ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

আধুনিক ভারত, নব ভারত আপনার এই মহান কীর্তিকে চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণে রাখবে। আধ্যাত্মিকতা ও জনসেবার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ যে হিংসাবিধ্বস্ত, ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীকে বাঁচানোর পথ দেখাতে চলেছে— সেই সুমহান কর্ম যজ্ঞে আপনিও হলেন অন্যতম কাণ্ডারি। তাই আপনার মতো মহাত্মা ব্যক্তিকে সশ্রদ্ধ চিত্তে বিনম্র প্রণতি জানাই।

—**রোমিল আচার্য,**
সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

পরম্পরা

বহুরূপেণ সংস্থিতা

মেঘদূত ভুঁই

যুগে-যুগে দেবী দুর্গা বহু নামে নানারূপে আবির্ভূতা। অশুভের বিনাশে শুভশক্তির পালনে দেবী শুভদা নামে খ্যাতা। কখনো মঙ্গলদাত্রী, কখনো আবার ভয়ঙ্করী। 'দুর্গা' নামের ব্যাখ্যা নানা পুরাণে নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'দুস্তরঃ যঃ ভবসংসার তত্র নৌ'— অর্থাৎ দুর্গম ভবসংসারে যিনি তরণী বিশেষ, তিনিই দুর্গ। 'দুজ্ঞেয়া'-দেবী দুরধিগম্যা। দেবী সকলের উপাস্যা কিন্তু তাঁর স্বরূপ অজানা। তিনি সকলের আদি জননী। নিখিল বিশ্বের বুদ্ধির অধিষ্ঠাশ্রী। জীবের দুর্গতি নাশ করেন বলেই তিনি দুর্গা নামে পরিচিতা। দেবী পুরাণ মতে তিনি দেহ দুর্গের অধিকারী— দুর্গেশ্বরী দুর্গা। দুর্গমাসুরকে বধ করার কারণে দেবতাদের দ্বারা বন্দিতা হয়ে তিনি দুর্গা নামে খ্যাতা। দেবী নিজেই বলেছেন— ''অদ্য প্রভৃতি সে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেষ্যতি। দুর্গাদৈত্যস্য সমরে পাতনাৎ অতি দুর্গমভি। যে মাং দুর্গাং শরণাগতা ন তেষাং দুর্গতিং কচ্চিৎ।'' —অর্থাৎ আজ থেকে আমার দুর্গা নামটি বিখ্যাত হলো। আমিই যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্গমাসুরকে বধ করেছি। যারা আমার শরণ নেবে তাদের আর কখনো কোনো দুর্গতি হবে না।

দেবী দুর্গার নানাবিধ রূপাধারের মধ্যে দশমহাবিদ্যাই বেশি খ্যাত। দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত হওয়ার জন্য মহাদেবের অনুমতি না পাওয়ায় দেবী বাধ্য হয়ে নিজ শক্তির তত্ত্ব প্রকাশ হেতু দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণ করেন। রূপগুলি হলো— কালী, তারা, যোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা, মাতঙ্গী, বগলা এবং কমলা। শিবের আবরণশক্তি হিসাবে আমরা নবদুর্গার আরাধনা করে থাকি। একই দেবীর এই নয়টি রূপ হলো— শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চণ্ডঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী ও সিদ্ধিদাত্রী।

এই প্রবন্ধের মূল বিষয় হলো— দেবী দুর্গার অষ্টশক্তি বা অষ্টমাতৃকা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচিতি জ্ঞাপন করা। বরাহপুরাণে অষ্টমাতৃকাশক্তির যে নামগুলি রয়েছে, সেগুলি হলো— (১) যোগেশ্বরী, (২) ব্রহ্মাণী, (৩) বৈষ্ণবী, (৪) মাহেশ্বরী, (৫) ইন্দ্রাণী, (৬) কৌমারী, (৭) বারাহী, (৮) নারসিংহী। এঁদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

(১) **যোগেশ্বরী :** অন্ধকাসুর বধকল্পে ক্রুদ্ধ-রুদ্রের মুখগহ্বর থেকে নির্গত অগ্নিশিখার থেকে যে শক্তি উৎপন্না হন তাঁরই নাম যোগেশ্বরী। অগ্নিবর্ণা এই দেবী অমিত ক্ষমতাধারিণী।

(২) **ব্রহ্মাণী :** ব্রহ্মশক্তির (বিষ্ণু) সঙ্গে সম্পর্কিত দেবীই হলেন ব্রহ্মাণী। হংসবাহিত বায়ুমান আরোহণকারিণী দেবী চতুর্ভুজা। দেবী জপমালা, কমণ্ডলু ও বর-অভয় মুদ্রাধারিণী। রক্তবর্ণা, ভয়ঙ্করনয়না, জটামুকুট সমাযুক্তা রক্তপদ্মে তিনি আসীনা। ভয়ঙ্করী এই মাতৃকাশক্তি কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে দৈত্যদের শক্তিহীন করেছেন।

(৩) **বৈষ্ণবী :** বিষ্ণুস্বরূপিণী মাতৃকাশক্তির নাম হলো বৈষ্ণবী। দেবী গরুড়-বাহনা, শ্যামবর্ণা ও সুন্দরী। বনমালায় দেবী শোভিতা, ষড়ভুজা এই দেবীর হস্তে বরদমুদ্রা,

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ও অভয়মুদ্রারূপ আয়ুধ থাকে। কখনো তিনি চতুর্ভুজা— শঙ্খ-ঘন্টা-গদা ও খড়্গাধারিণী।

ত্রিপুরায় বৃহদাকার কালো কষ্টিপাথরে এরূপ মূর্তি খোদিত আছে। মসৃণ পাথরটির উপর চালির মধ্যভাগে ত্রিনয়না দেবী অবস্থান করছেন গরুড়ের মস্তকের উপর দেবী আসীনা। অষ্টভুজা, শাড়িপরিহিতা এই দেবী বৈষ্ণবীচণ্ডিকা নামে পরিচিতা।

(৪) **মাহেশ্বরী :** মহেশ্বর থেকে মাহেশ্বরী শক্তির আবির্ভাব। দেবী শ্বেতবর্ণা, চতুর্ভুজা ও ত্রিনেত্রা। হস্তে থাকে ত্রিশূল, অক্ষমালা ও বরাভয়। বৃষারূঢ়া এই দেবী জটামুকুটধারী, মাথায় চন্দ্রকলা শোভিতা। তিনি শিবের মতোই দেখতে।

(৫) **ইন্দ্রাণী :** ইন্দ্র থেকে ইন্দ্রাণী। চতুর্ভুজা এই দেবীর গাত্রবর্ণ রক্তাভ। হাতে থাকে শক্তি-বজ্র ও বরাভয়। তিনি গদবাহনা সর্বাভরণ ভূষিতা ও সহস্রলোচন সমৃদ্ধা।

(৬) **কৌমারী :** কৌমারীদেবী কার্তিকের শক্তি। কার্তিক থেকে কৌমারী। দেবসেনাপতির মতোই দেখতে। ময়ূর ও কুক্কুট পরিবেষ্টিতা। তিনি চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা। নিষ্পাপা এই দেবী নাকি কার্তিকের মতো ষড়ানন, দ্বাদশনয়না ও দ্বাদশভুজা (অন্যমতে)।

(৭) **বারাহী :** বরাহরূপী বিষ্ণু থেকে বারাহী শক্তির আবির্ভাব। এই দেবী বরাহবদনা, কৃষ্ণবর্ণা ও পীতাম্বর পরিহিতা। নানা অলঙ্কারে দেবী ভূষিতা। চতুর্ভুজা এই দেবীর হস্তে থাকে—মুষল, হল, বরাভয় এবং চক্র। তিনি ধরণীর উদ্ধারকারিণী শক্তি। ভয়ঙ্কর চক্র ধারণ করে তিনি ধরণীকে উদ্ধার করেন।

বারাহী চণ্ডীর পূজা প্রচলিত রয়েছে হাওড়া জেলার শ্যামপুর পিছলদহ গ্রামে। পাথরের মূর্তিটি (বারাহী) মস্তকবিহীন। লোকসংস্কৃতিবিদ তারাপদ সাঁতরা এই মূর্তিটিকে নৃসিংহমূর্তি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। ভাস্কর্যশৈলীর নিরিখে মূর্তিটিকে পালযুগের নিদর্শন বলে সনাক্ত করা হয়েছে। শারদীয়া দুর্গাপুজার প্রথানুযায়ী চারদিন ধরে বারাহীদেবীর পূজা সম্পন্ন হয়ে থাকে।

(৮) **নারসিংহী :** নরসিংহ মূর্তির শক্তিরূপে দেবীর প্রকাশ। ভয়ঙ্কর দর্শনা নারসিংহী হিরণ্যকশিপুকে বধ করে ত্রিলোক রক্ষা করেন। নারায়ণের চতুর্থ অবতারের শক্তিই হলো নারসিংহী।

অসুরগণের ধ্বংসার্থে এবং সুর বা দেবতাদের রক্ষার্থে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রমুখ দেবতা যাঁরা অমিত বীর্যশালী তাঁদের দেহ হতে দেবীশক্তিবর্গ নির্গত হয়ে সেই দেবতাদের অনুরূপ মহাদেবী চণ্ডিকার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন। 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'-তে তার বর্ণনাটি এরূপ :

হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্র—কমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তিব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে।।
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা।।
কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবাহনা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী।।
তথৈব বৈষ্ণবী শক্তির্গরুড়োপরি সংস্থিতা।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ খড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ।।
যজ্ঞবারাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতো হরেঃ।
শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তনুম্।।
নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ।
প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপ-ক্ষিপ্তনক্ষত্র-সংহতিঃ।।
বজ্রহস্তা তথৈবৈন্দ্রী গজরাজোপরিস্থিতা।
প্রাপ্তা সহস্রনয়না যথা শক্রস্তথৈব সা।।
ততঃ পরিবৃতস্তাভিরীশানো দেবশক্তিভিঃ।
হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যাহ চণ্ডিকাম্।।

দেবতাদের নিজ-নিজ বাহনে দৈবীশক্তিসমূহ সমর সাজে সজ্জিতা হয়ে দেবী চণ্ডিকার সামনে উপস্থিত হলেন। মহাদেব বহুবিধ দেবশক্তি দ্বারা সমাবৃত হয়ে দেবী চণ্ডিকাকে বললেন—আমার প্রীত্যর্থে আপনি অসুর সেনা সকলকে বিনাশ করুন।

ঋণ স্বীকার :
১। শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী অমলানন্দ সরস্বতী।
২। রবিলোচন মণ্ডল—মোলবনা।

Swachchha Bharat   Swabolombee Bharat
How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street, Kolkata - 700 016
M : 98311 85740, 98312 72657,
Visit Our Website :
www.calcuttawaterproofing.com

কিশোরী কন্যারূপে দেবী দুর্গার আত্মপ্রকাশ

রূপশ্রী দত্ত

শারদীয়া দুর্গাপূজা বাঙালির প্রাণের জিনিস। ভক্তিরস ও আধ্যাত্মিকতার সীমা অতিক্রম করে দুর্গাপূজা জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। বঙ্গে, বহির্বঙ্গে, এমনকী বহির্ভারতেও কয়েকজন বাঙালি একত্র হলেই সাধারণত দুর্গাবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন ও দুর্গাপূজা প্রচলন করেন। জগজ্জননী দেবী দুর্গার সঙ্গে লৌকিক কিশোরী কন্যার অনুষঙ্গ ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে বাংলার মাটিতে। কিশোরী কন্যারূপে দেবীর আত্মপ্রকাশ সাধারণ লোকচক্ষেও দৃশ্যমান হয়েছে। এই ধরনের পূজার একটি অনুষ্ঠিত হয় হাওড়া জেলার শিবপুরে। অন্যটি নদীয়া জেলার চাকদহ থানার শিমুরালি গ্রামে। শিবপুরে দুর্গাপূজার প্রাচীনত্ব নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক তাৎপর্যেরও দাবি রাখে। তখন ১৬৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দ। ভারতের ইতিহাসে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল। এই সময় রামব্রহ্ম রায়চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি ঔরঙ্গজেবের আনুকূল্য লাভ করেন। ঔরঙ্গজেব তাঁকে 'রাজা' উপাধি দেন এবং শিবপুর-সহ এগারোটি অঞ্চলের মালিকানা প্রদান করেন।

ধনসম্পদ লাভের পর রামব্রহ্ম দীঘি খনন করালেন; তার পাশে শিবমন্দির ও মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করলেন। মন্দিরের পিছনে নানা বর্ণগন্ধের পুষ্পোদ্যানও রচনা করলেন। তিনি প্রতিদিন দীঘিতে স্নান করে, ফুল তুলে শিবমন্দিরে পূজা করতেন। এমন সময়ই বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর দুর্গাপূজার সূচনা হয়। রামব্রহ্মের একটি কিশোরী কন্যা ছিল। সে প্রতিদিনই উদ্যানে খেলা করত। সে পিতার কাছে তারই সমবয়স্কা 'পদ্মা' নামে এক সঙ্গিনীর কথা বলত। পদ্মা প্রতিদিন রামব্রহ্মের কন্যার সঙ্গে উদ্যানে খেলায় যোগদান করত। রামব্রহ্ম কন্যাকে বলে তার সঙ্গিনীকে গৃহে আনতে। কিন্তু কন্যা জানায় পদ্মা গৃহে আসতে রাজি নয়। কৌতূহলী রামব্রহ্ম উদ্যানে গিয়েও তার দেখা পাননি। বিস্মিত কন্যা বলে— 'এক্ষুনি তো খেলছিল। কখন যেন চলে গেল। ওই তো তার পায়ের ছাপ রয়েছে মাটিতে।' রামব্রহ্ম বুঝলেন পদ্মা সাধারণ কিশোরী নয়। সে রাত্রে রামব্রহ্ম স্বপ্ন দেখলেন, এক কিশোরী কন্যা তাঁকে বলছে— 'আমিই পদ্মা। আমিই দুর্গা। আমার পূজা করলেই তো তোমার আমাকে দেখা হবে।' সেদিন ভাদ্রমাসের কৃষ্ণানবমী। শারদীয়া দুর্গা পূজার আর বেশি দেরি নেই। স্বপ্নাদেশ পেয়ে রামব্রহ্ম সাময়িক আটচালাতেই পূজা আরম্ভ করলেন। পরবর্তীকালে পাকা মন্দির-সহ নাটমন্দির, সুন্দর আটচালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আটচালা এখনও 'সাজা-র আটচালা' নামে পরিচিত আছে।

মহাকালের নদী থেকে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। রামব্রহ্মের আমলে দুর্গাপূজার চারদিন যে ঝাড়লণ্ঠনের রোশনাই, সানাইয়ের মূর্ছনা, ঢাকের আওয়াজ যাত্রাপালা অভিনয় হোত— এ সবই এখন অবলুপ্ত হয়েছে। আপামর জনসাধারণের এলাহি পংক্তিভোজনের দিনও আজ অতীত। কিন্তু শিবপুরের চৌধুরীবংশের পরবর্তী প্রজন্মের আন্তরিক নিষ্ঠা ও ভক্তি আজও এই পূজাকে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

প্রাচীন বহু রীতিই এখানে সাধ্যমতো পালন করা হয়। পারিবারিক সদস্যদের সাহায্য ও সহযোগিতা এবং দেবোত্তর সম্পত্তির আয় থেকেই এই পূজা পরিচালিত হয়। বাইরের কোনো সাহায্য নেওয়া হয় না।

মা দুর্গার কিশোরী কন্যারূপে আত্মপ্রকাশের আর এক নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল নদীয়ার শিমুরালি গ্রামে। ১৭৫৭ সালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় শিমুরালি গ্রামের বাসিন্দা নৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় একদা এক কিশোরীকন্যাকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি আত্মপরিচয় দিয়ে নৃসিংহকে দুর্গাপূজা প্রচলন করতে বললেন।

পূজানুষ্ঠানের সময় একদিন এক কিশোরীকে দুর্গাপূজার নৈবেদ্য ভক্ষণ করতে দেখা গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর তাঁকে সমবয়স্কাদের সঙ্গে গল্প করতেও দেখা গিয়েছিল। সে রাত্রেও দেবীদুর্গা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাউকে স্বপ্নে বলেছিলেন— কিশোরীরূপে তিনিই দুর্গাপূজার নৈবেদ্য ভোজন করেছেন। গ্রামের অনেক মানুষ সেই কিশোরীকে মন্দিরপ্রাঙ্গণে ঝাঁট দিতেও দেখেছেন। কাছে গেলেই সে হাসতে হাসতে অন্তর্হিতা হয়। স্নেহের বন্ধনে বাঁধা কিশোরী কন্যারূপিণী দুর্গাকে এখানে আদর করে 'বুড়িমা' বলা হয়। বিজয়াদশমীর দিন বুড়িমার বিসর্জনের পর এ অঞ্চলের অন্য দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জন হয়। এইভাবেই দেবী-মানবী, লৌকিক-অলৌকিক মিশে গেছে কবিরও কণ্ঠে--- ''আর পাব কোথা/দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।' ■

ব্যাঙের সমুদ্র দেখা

গ্রামের ধারে কবেকার পুরনো এক পাতকুয়োর ফাটলের মধ্যে কোলাব্যাঙ তার পরিবার নিয়ে থাকত। গ্রামের মেয়েরা সেখানে জল তুলতে এসে যেসব কথাবার্তা বলত কোলাব্যাঙ তার ছেলেদের সেইসব কথা বুঝিয়ে দিত— আর ছেলেরা ভাবত 'ইস্! বাবা কত জানে!'

একদিন সেই মেয়েরা সমুদ্রের কথা বলতে লাগল। ব্যাঙের ছানারা জিজ্ঞাসা করল— "বাবা! সমুদ্র কাকে বলে?" ব্যাঙ খানিক ভেবে বলল, "সমুদ্র? সে একরকম জন্তুর নাম।" তখন একটা ছানা বলল— "ওরা যে বলছিল সমুদ্র খুব ভয়ানক বড় হয়, আর তার মধ্যে অনেক জল থাকে— আর লোকেরা সাঁতার কেটে তা পার হতে পারে না। কোলাব্যাঙ তখন মুশকিলে পড়ল। সে গাছপালা দেখেছে, বাড়িঘর দেখেছে— মানুষ কুকুর ঘটি বাটি নানারকম জিনিসপত্র দেখেছে আর ছেলেবেলায় অনেকরকম জিনিসের গল্প শুনেছে। কিন্তু সমুদ্রের কথা তো কখনো শোনেনি। তখন সে ভাবল সমুদ্রের কথা একটু খোঁজ করে দেখতে হবে।

পরদিন সকালে উঠেই কোলাব্যাঙ তার ছাতা পোঁটলা নিয়ে বলল, "আমি সমুদ্রের সন্ধান করতে যাচ্ছি।" এই শুনে তার বউ কত কাঁদল, ছেলেরা নানারকম সুর করে তাকে বারণ করল কিন্তু কোলাব্যাঙ বলল, "না, এতে আমার জ্ঞানলাভ হবে— তোমরা বাধা দিও না।" এই বলে সে পাতকুয়ো থেকে উঠে একটা মাঠের দিকে চলল। ব্যাঙ বাইরে এসেই দেখে মানুষ কুকুর গোরু তারা কেউ তার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলে না— তাই দেখে সে ভাবল 'লাফিয়ে চললে সবাই আমায় বেকুব ভাববে।' এই ভেবে সে হেঁটে হেঁটে চলতে লাগল। কিন্তু অমন করে চলা তো তার অভ্যেস নেই— খানিক গিয়েই সে ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়লো।

মাঠের ওপারে এক গ্রামের কাছে এক গর্তের মধ্যে মেঠো ব্যাঙের বাসা ছিল। মেঠো ব্যাঙেরাও সমুদ্রের কথা শুনেছে, তাই তাদের মধ্যেও একজন বেরিয়েছে সমুদ্রটা দেখতে। মাঝখানে দুই ব্যাঙের দেখা হলো। কোলাব্যাঙ বলল, "আমি ফাটল-কুয়োর কোলাব্যাঙ, যাচ্ছি সমুদ্রে।" মেঠো ব্যাঙ বলল, "আমি মেঠো ব্যাঙ, আমিও যাচ্ছি সমুদ্রে।" তখন তাদের ভারি ফুর্তি হলো।

কিন্তু সমুদ্রে যাবার পথ তো তারা জানে না। মাঠের মধ্যে একটা মস্ত ঢিপি ছিল, মেঠো ব্যাঙ বলল, "ওর উপরে উঠে দেখি তো কিছু দেখা যায় কিনা।"

এই বলে তারা অনেক কষ্টে সেই ঢিপির উপর চড়ে সেখান থেকে একটা গ্রাম দেখতে পেল। মেঠো ব্যাঙ বলল, "আরে দুর ছাই! এরকম তো ঢের দেখেছি! আমার বাড়ির কাছেই তো অমন আছে।" কোলাব্যাঙ বলল, "তাই তো! আমিও ছেলেবেলা থেকে ওরকম কত দেখেছি। সব জায়গাই দেখছি একরকম। মিছামিছি আমরা হেঁটে মরলাম।"

তখন তারা ভারই বিরক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল। কোলাব্যাঙ তার ছানাদের বলল, "সমুদ্র টমুদ্র বলে কিছু নেই— ওসব মিথ্যে কথা।"

রাজ্য পরিচিতি

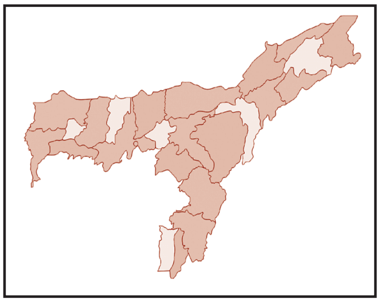

অসম

পূর্ব ভারতের একটি অন্যতম রাজ্য অসম। ঐতিহাসিক ভাবে এই রাজ্যটি প্রাগজ্যোতিষপুর নামে পরিচিত ছিল। এর একদিকে বাংলাদেশ অন্যদিকে ভুটান। দুটি আন্তর্জাতিক সীমানা থাকার জন্য অসমের অবস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য জুড়ে গারো, খাসি অসংখ্য ছোট ছোট জনগোষ্ঠীর বাস। তাই এখানকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলও ভিন্ন ভিন্ন। বিহু অসমের প্রধান নৃত্য ও উৎসব। ব্রহ্মপুত্র নদ এই রাজ্যের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে। এখানকার কাজিরাঙা অভয়ারণ্যকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের আখ্যা দিয়েছে। কামাখ্যা এখানকার মূল তীর্থক্ষেত্র। অসমের রাজধানী দিসপুর। এছাড়াও গুয়াহাটি, ডিব্রুগড় এখানকার বড়ো শহর। অসমের মোট আয়তন ৭৮,৪৩৮ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৩ কোটি ১১ লক্ষ ৬৯ হাজার ২৭২ জন।

প্রশ্নবাণ

১.সম্প্রতি কোন্ ভারতীয় গুগল-এর শীর্ষপদে নিযুক্ত হয়েছেন?

২.ফেসবুক কত সালে চালু হয়?

৩.মাইক্রোসফ্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা কারা?

৪.রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বর্তমান গভর্নর কে?

৫.প্রসার ভারতীর চেয়ারপার্সন কে?

উত্তর : ১. সুন্দর পিচাই। ২. ২০০৪। ৩. বিল গেটস্ ও পল অ্যালেন। ৪. রঘুরাম গোবিন্দ রাজন। ৫. জহর সরকার।

ছবিতে অমিল খোঁজ

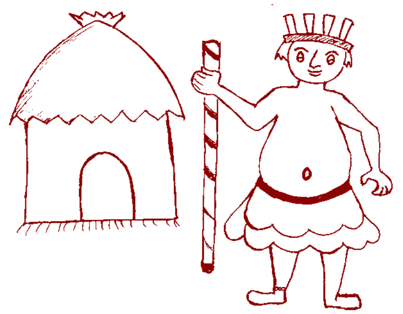

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) সা ঙ্গা গ র

(২) সু র্ণ ব ক

১৭ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) পরশপাথর (২) কপালকুণ্ডলা

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) শ দে প তো হি

(২) গ সা ম হি র

১৭ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) অনাদিকাল (২) অন্নদাশঙ্কর

উত্তরদাতার নাম

(১) অনুশ্রী হালদার, নিবেদিতা নগর, কলকাতা-৪৬।

(২) উজ্জয়িনী বিশ্বাস, গাজোল, মালদা।

(৩) সংজ্ঞা ঘোষ, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

(৪) ঝিলিক রায়, মুন্সীরহাট, হাওড়া

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

চম্বা রুমাল—রোজগার, সম্মান এবং সংস্কৃতির প্রতীক

সুতপা বসাক ভড়

হিমাচল প্রদেশ হিমালয়ের কোলে নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরপুর প্রাণবন্ত একটি পাহাড়ি রাজ্য। এখানকার সমাজ ব্যবস্থা অনেকটাই চলে দেবদেবীর নির্দেশে। ধর্মপ্রবণ এখানকার মানুষ। দেবভূমি হিমাচলে দেবদেবীদের অবস্থান এবং প্রাচীন সংস্কৃতির ছাপ স্পষ্টত দেখা মেলে। উঁচু পাহাড়ের কোলে ছোট্ট ছোট্ট গ্রামগুলি যেন ছবির মতো। এই প্রত্যন্ত গ্রামগুলি বাইরের জগতের সঙ্গে অনেকটাই সম্পর্কহীন। শান্ত, সরল পাহাড়ি লোকজন এই পরিবেশে একদম মানানসই। কিন্তু এই সৌন্দর্য এবং সরলতার সঙ্গে সঙ্গে নেশার আধিক্যও দিনে দিনে বেড়ে চলেছে এই পাহাড়ি রাজ্যটিতে। এখানকার পুরুষ-মহিলারা অনেকেই নেশায় আসক্ত। যুবসমাজ আরও বেশি। চরস, ভাং, গাঁজা, মদ সবই চলে। প্রত্যন্ত গ্রামে গরিব মহিলারা ঘরে ঘরে চরস বানায়। ইচ্ছা বা অনিচ্ছার সঙ্গে বেআইনি চরস বানানোর কাজে মন লাগে না বেশিরভাগ মহিলারাই, অথচ দারিদ্র্যের জন্য পরিবারের মুখ চেয়ে তারা করতে বাধ্য হয়।

আশার কথা, বর্তমানে সরকার, সামাজিক সংস্থাগুলি, কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগ এগিয়ে এসে ওইসব গরিব মহিলাদের স্বরোজগারের পথ দেখাচ্ছে— যা তাদের সম্মানীয়, আদরণীয় এবং আর্থিকভাবে লাভান্বিতও করছে।

হিমাচলের নিজস্ব সংস্কৃতি-নির্ভর শিল্পগুলির মধ্যে পড়ে হিমকুনকরের কুল্লুপাল, টুপি, মোজা। নুরপুরের সিল্ক। চম্বার চপ্পল। কাংড়ার চিত্রশিল্প, চম্বার রুমাল ইত্যাদি। এগুলি খুবই রুচিকর এবং সংগ্রহ যোগ্য শিল্প নমুনা। হিমাচল প্রদেশে বেড়াতে এসে দেশ-বিদেশের পর্যটকেরা এখানকার নৈসর্গিক দৃশ্যে অভিভূত হন এবং ঐসব শিল্পকৃতি সংগ্রহ করে নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে যান হিমাচলের স্মৃতি নিয়ে— এগুলি ভোলার নয়। এইসব পর্যটকেরা অনেকে জানতেই পারেন না যে, তাঁরা ওইসব হাতে বানানো জিনিস কিনে কীভাবে হিমাচলের প্রত্যন্ত গ্রামের গরিব মহিলাদের সাহায্য এবং উৎসাহিত করে স্বরোজগারের পথে আরও এগিয়ে দেবার জন্য।

এইরকম একটি হস্তশিল্প হলো চম্বার রুমাল। অতীতে হিমাচল প্রদেশের সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা অবসর সময়ে রেশমি সুতো দিয়ে ফুল, লতা-পাতার নক্‌শা বানাতেন কাপড়ের ওপর। মনে হোত চিত্রকর যেন

রুমালের ওপর শিল্পকর্ম করেছেন। একেবারে প্রথমে সাধারণ সুতির কাপড়ে (বর্গাকার বা আয়তাকার) কালো রঙে নক্‌শা বানানো হোত। তারপর মহিলা শিল্পীরা রং-বেরঙের রেশমি সুতো দিয়ে সুন্দর সুন্দর রুমাল বানাতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা গাছপালা বা ফুলের ভেষজ রঙে নিজেরাই সুতো রাঙিয়ে নিতেন। ওই রাঙিয়ে নেওয়া সুতো দিয়ে তাঁরা 'দো রুখা' বা 'কব্বল সাটিন স্টিচ'-এর মাধ্যমে এত সুন্দর নক্‌সা বানাতেন যে কাপড়ের সোজা-উলটো দু-দিক থেকে একইরকম নক্‌শা তৈরি হোত। এইরকম একটি আশ্চর্য, সুন্দর শিল্পকৃতি ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে চলেছিল।

১৯৬৫ সালে যখন চম্বার বয়স্ক শিল্পী মহেশী দেবী চম্বা রুমালের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেলেন, তখন সরকারের হস্তশিল্প বিভাগের চম্বাতে রুমাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার কথা মনে হলো। যদিও এখন সেই কেন্দ্র প্রায় বন্ধ হবার মুখে, তবু সুরজ বেগম নাম্নী এক মহিলা এই শিল্পকে পুনরায় জীবন্ত করার কাজে এগিয়ে এসেছেন।

বর্তমানে এই লুপ্তপ্রায় শিল্পটি আবার ধীরে ধীরে জেগে উঠছে এবং অনেক দরিদ্র মহিলারা এবং তাঁদের পরিবার এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভাবে লাভান্বিত হচ্ছেন। দেশ-বিদেশের পর্যটকরা এই রুমাল খুবই পছন্দ করছেন। এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, চম্বার পাক্কা টালা মহল্লার বাসিন্দা সুরজ বেগম প্রথমে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত মহেশী দেবীর থেকে এই শিল্প শেখেন। তারপর পুরনো লোকপ্রিয় ও নতুন বিষয়ের মিলন করে নতুন নতুন নক্‌শা বানিয়ে চম্বা রুমালকে আরও আকর্ষক এবং আধুনিক করে তোলেন। বর্তমানে, তিনি ফিরদৌস হ্যান্ডিক্রাফ্‌ট নামে চম্বাতে একটি রুমাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালাচ্ছেন। এখানে মহিলাদের নিঃশুল্ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আজ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার মহিলা এখান থেকে প্রশিক্ষিত হয়ে নিজেরাই নিজেদের কর্মসংস্থান করে নিয়েছেন। বর্তমান বাজারে একটি চম্বা রুমালের দাম একশো টাকা থেকে শুরু করে কুড়ি হাজার টাকা। চম্বা-রুমালের বিশেষত্ব এই যে, সোজা-উলটো দু'দিকেই একইরকম নক্‌শা দেখা যায়। এ বিষয়ে উল্লেখনীয়, এই সেলাই-য়ে মেশিনের বা যন্ত্রের কোনো ব্যবহার নেই— সম্পূর্ণ সেলাই মহিলারা হাতে করেন। সুরজ বেগমের থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক মহিলাই লাভান্বিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার আলাদা কেন্দ্র চালিয়ে নতুন মেয়েদের শেখাচ্ছেন প্রায় হারিয়ে যাওয়া বহু পুরানো অথচ লেকপ্রিয় এই শিল্প। তাঁদের মধ্যে সুন্দরীদেবী, রেখাদেবী যেমন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তেমনি নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থী— নেহা খান, নাদিয়া খানের উৎসাও দেখার মতো। সম্পূর্ণ স্বদেশি সংস্কৃতির মধ্যে সসম্মানের সঙ্গে স্ব-রোজগারের পথ খুঁজে পেয়েছেন এইসব মহিলারা। অভিনন্দনের যোগ্য তাঁরা।■

অতিথি কলম

সন্ত্রাসের ছায়া পূর্ব দিগন্ত পর্যন্ত প্রলম্বিত

সুবীর ভৌমিক

পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরে সন্ত্রাসী হানা নতুন দিল্লীর কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। তদন্ত সংস্থার (আই বি) খবর, লস্কর-ই-তৈবা উফায় সংঘটিত মোদী-শরিফ আলোচনা ভালভাবে নেয়নি। ফলত এরা পাঞ্জাব, দিল্লী-সহ উত্তরপূর্ব ভারতে সন্ত্রাসী হামলা চালাবার চেষ্টা চালাচ্ছে। ভারতীয় গোয়েন্দাবাহিনীর মতে লস্কর-ই-তৈবা ফের তৎপর এবং পাকিস্তানি সেনা ও আই এস আই-এর সহযোগে শান্তি প্রক্রিয়া বানচাল করতে উদ্যোগ নিচ্ছে। গুরুদাসপুরে যে হামলা হয়েছে তাকে খালিস্তানি হামলা বলে মান্যতা দেওয়া যায় না, কেননা এই হামলায় যারা জড়িত তাদের কেউই শিখ নয়।

পাকিস্তানের অন্যসব মৌলবাদী সংগঠন যারা আগে সক্রিয় ছিল, তারা কেউই পুরোদস্তুর পাকসেনা নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না। যেমনটা কিনা লস্কর-ই-তৈবা। কিন্তু এখন এদের ক্রিয়াকলাপ

> **আই এস আই ক্রমশই বাংলাদেশে তাদের জমি হারাচ্ছে। জামাত-ই-ইসলামি এবং অন্য মৌলবাদী সংস্থাগুলি সেদেশে কোণঠাসা এবং এদের নেতা সালাউদ্দীন চৌধুরী ফাঁসিতে লটকেছেন। তাই মায়ানমারের রোহিঙ্গারাই এদের শেষ ভরসাস্থল।**

সেনাবাহিনীর কর্তাব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রিত এবং নিশ্চিতভাবে এদের চালাচ্ছে আই এস আই। তেহেরিক্-ই-তালিবান যারা পাক সেনাদের ওপর হামলা চালিয়েছে এমনকী এরা সেনা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও হামলা চালিয়েছে; এদের পৃষ্ঠপোষকতা পাকসেনা করে না। সুতরাং এল ই টি হলো পুরোপুরি সেনা মদতপুষ্ট, কারণ পাকসেনা নিজেদের আড়ালে রেখে এদের মাধ্যমে ভারতের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটিয়ে রক্ত ঝরাতে চায়। এরা চায় ভারত সহস্র ক্ষত নিয়ে চলুক। তাই সেনা-আই এস আই যুগল সংস্থা চায় কাশ্মীর বাদ দিয়ে রাশিয়ার উফায় মোদী-শরিফ যে দ্বৈত বৈঠক হয়েছিল তা ভেস্তে যাক। তাই সারতাজ আজিজকে কড়া শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে, তাঁকে জোর দিতে হয়েছে আলোচনার মূলবিন্দু হোক কাশ্মীর ইস্যু।

অতি সম্প্রতি ভারত এবং পশ্চিমি গোয়েন্দারা খবর দিচ্ছে এল ই টি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দ্রুততার সঙ্গে জাল বিস্তার করছে। বার্তায় বলা হচ্ছে যে, এল ই টি এবং তার দুই সহযোগী গোষ্ঠী মায়ানমার এবং বাংলাদেশে সক্রিয়। ওই দুই দেশ থেকে এরা রোহিঙ্গা মুসলমান যুবকদের তাদের দলে ভর্তি করাচ্ছে। পাকিস্তানে পাঠিয়ে অস্ত্র শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে অন্তর্ঘাত এবং ফিঁদায়ে গোষ্ঠী তৈরি করে গুরুদাসপুর কায়দায় সন্ত্রাস চালাবার প্রচেষ্টা করছে। এল ই টি দুই সহযোগী দলের সাহায্যে অশান্তিপ্রবণ অঞ্চল রাখাইন প্রদেশে ঢুকেছে। এই দুই গোষ্ঠী জামাত-উদ্-দোয়া এবং ফালা-হি-ইনসানিয়াত ফাউন্ডেশন। এরা প্রকাশ্যে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ করে থাকে। ২০১২ সাল থেকে বৌদ্ধ রাখাইন গোষ্ঠীর সঙ্গে দাঙ্গায় প্রভূত ক্ষতি হয়েছে রোহিঙ্গাদের। মায়ানমার প্রশাসন খাল কেটে কুমির এনেছে এই দুই সংস্থাকে কাজকর্ম চালাবার অনুমতি দিয়ে। পাকিস্তানি সরকারের অনুরোধের সুযোগ নিয়ে এখন এই দুই গোষ্ঠী প্রবেশ করেছে অনেক গভীরে এবং সেখান থেকে সংবেদনশীল অনেক তথ্য পাচার হচ্ছে। বাংলাদেশকেও সতর্ক করা হয়েছে। কারণ দেশের গোয়েন্দা সূত্র বলছে, এল ই টি আসলে আই এস আই-এর ইচ্ছা পূরণ করতে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে যে মৈত্রী ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠছে তা বানচাল করতে চায়। পাকসেনা বি বি আই এন মোটর ভেহিক্যাল প্যাক্টকে ভাল চোখে দেখছে না, কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভারত, বাংলাদেশ, ভুটান এবং নেপাল। পাকসেনা ভাবছে, আগামী সার্ক সম্মেলনে ভারত পাকিস্তানকে একঘরে করে দেবে। বাংলাদেশ গোয়েন্দারা প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, রেলের মতো বিশেষ ক্ষেত্রকে হামলার লক্ষ্যস্থল হিসেবে বেছে নিতে পারে জঙ্গিরা।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' মোদী সরকারকে সতর্ক করে বলেছে বাংলাদেশ, মায়ানমারের মতো দেশের সঙ্গে যেখানে সীমানা রয়েছে সেখানে সুপরিকল্পিত সন্ত্রাসবাদী হামলার কথা (সংবাদ অনুসারে, এল ই টি বেশ ভাল সংখ্যায় পাকা প্রশিক্ষিত রোহিঙ্গাদের নিয়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের কক্সবাজার অঞ্চল দিয়ে ফের ঢুকেছে এবং

মায়ানমারে প্রবেশ করেছে রাখাইন প্রদেশ দিয়ে)। 'র'-এর সন্দেহ রাখাইন অঞ্চলে ভয়ঙ্কর জঙ্গি হানার মাধ্যমে ২০১২ সালের মতো ধর্মকে সুড়সুড়ি দিয়ে ফের হামলা হলে সেখান দিয়ে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের মাধ্যমে পূর্বভারতে ঢুকে পড়বে। এই নিষ্ক্রমণ কেবল এই দুই দেশে নাগরিক সমস্যাই বাড়াবে না, বরং উলটে এল ই টি ঘোলাজলে মাছ ধরে আরও অনেক বিপথগামী যুবককে সন্ত্রাসবাদী জালে জড়িয়ে ফেলবে।

আই এস আই ক্রমশই বাংলাদেশে তাদের জমি হারাচ্ছে। জামাত-ই-ইসলামি এবং অন্য মৌলবাদী সংস্থাগুলি সেদেশে কোণঠাসা এবং এদের নেতা সালাউদ্দীন চৌধুরী ফাঁসিতে লটকেছেন। তাই মায়ানমারের রোহিঙ্গারাই এদের শেষ ভরসাস্থল। জে ইউ ডি-র মাধ্যমে এল ই টি চলছে বাংলাদেশে এবং পাক দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে এফ আই এফ চলছে।

এফ আই এফ-এর সহ-সভাপতি সঈদ মেহমুদ এবং সিন্ধ প্রবক্তা নাদিম আওয়ান রোহিঙ্গা ত্রাণ কাজের অছিলায় বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্ত অঞ্চল ঘুরে গেছেন। অভিযোগ, এদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো বিপথগামী রোহিঙ্গা যুবকদের ভর্তি করিয়ে অস্ত্র প্রশিক্ষণে পাকিস্তানে প্রেরণ করা। এক পশ্চিমি গোয়েন্দা অফিসারের উদ্ধৃতি দিয়ে মায়ানমারের মিজ্জিমা নিউজ জানিয়েছে যে, সমস্ত দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইসলামিক সন্ত্রাসী দলগুলির মধ্যে এল ই টি-র নেটওয়ার্ক সবচেয়ে বেশি পরিব্যাপ্ত এবং সন্ত্রাসবাদী দল হিসেবে চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও আর্থিকভাবে সবচেয়ে সচ্ছল।

এল ই টি প্রধান রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের কথা সর্বত্রই বলে বেড়াচ্ছে এবং সেই সঙ্গে বদলার হুমকিও। রাষ্ট্রসঙ্ঘকে দায়ী করে রোহিঙ্গা সমস্যায় পশ্চিমিদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে বলে বেড়াচ্ছে। ২০১২ জুলাইয়ে রাখাইন প্রদেশে দাঙ্গার পর মায়ানমারের এল ই টি-র ছায়া সংগঠন জে ইউ ডি দিফা-ই-মুসলমান আরাকান সম্মেলন করাচিতে সংগঠিত করে ক্যাডারদের নির্দেশ দেয় যে, রোহিঙ্গাদের ভর্তি করিয়ে দাঙ্গার বদলা নিতে। মৌলানা আব্দুস কুদ্দুস বার্মি, আরাকানের হরকত-উল-জেহাদ প্রভৃতি ব্যক্তিদের সঙ্গে ওই সম্মেলনে একই মঞ্চে বসেন হাফিজ সঈদ। এফ আই এফ চেয়ারম্যান সঈদের সঙ্গে একই মঞ্চে বসে আরাকানে বদলার আহ্বান জানান।

ভারতীয় গোয়েন্দারা দেখেছে যে, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, উত্তরপূর্ব ভারত থেকে মুসলমান যুবকরা দলে দলে যে চলে এসেছে এবং তার পিছনেও এল ই টি-র হাত ছিল। এল ই টি ওই মুসলমানদের ভড়কে দিয়েছিল। এইসব মুসলমানরা এসেছে অসম নাগা, মণিপুর, মিজোরাম থেকে। বলা হচ্ছে, এল ই টি তার ভারতীয় মুজাহিদিন সাগরেদদের কাজে লাগিয়ে ২০১২-র রাখাইনের বদলা নিতে বোধগয়ায় বৌদ্ধবিহারে হামলা চালিয়েছে, কারণ সেখানে মায়ানমার থেকে বহু বৌদ্ধ তীর্থ করতে আসেন।

এল ই টি পাকিস্তানে সক্রিয়। সেইজন্যই তো ২০০৮ সালের মুম্বই হামলার চাঁই জাকিউর রহমান লাকভি সেখানে অবাধে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু যেটা অনেকেরই জানা নেই যে, এল ই টি-র সক্রিয়তাতেই পাকিস্তান সরকার এই বছরের জেনেভায় অনুষ্ঠিত ২৯ তম ইউ এন হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলে মায়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের কথা ওঠায়।

পাক স্পনসর্ড প্রস্তাবে রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর মানবতাবিরোধী কার্যকলাপের কথা তোলা হয়। মায়ানমার সরকারকে বলা হয় যে, সেখানকার সরকার মানবাধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে রোহিঙ্গা মুসলমানদের রক্ষা করুক এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার হাই কমিশনারকে এক রিপোর্ট পেশ করতে অনুরোধ করে তিরিশতম অধিবেশনে। সেইসঙ্গে মায়ানমারে যেভাবে মুসলমান সংখ্যালঘু-সহ অন্য সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অত্যাচার চলছে তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয় বত্রিশতম অধিবেশনে।

পাকিস্তান যখন একদিকে মায়ানমারকে মানবতা বিরোধী বলে বিদ্ধ করছে, অন্যদিকে আবার ইসলামাবাদ প্যাগোডা রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। ঠিক পাকিস্তান যেমনটা করে এসেছে ভারত, বাংলাদেশের সঙ্গে। পাকিস্তানের এই দুমুখো নীতির ব্যাপারে মায়ানমার সত্যটা বুঝতে পারছে। পাকিস্তান মায়ানমারের সঙ্গে সেনা সখ্য চাইছে, কারণ ভারত যেন সেখানে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। আবার, ইসলামি রাষ্ট্রগুলির সহায়তা পেতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মঞ্চকে ব্যবহার করে রোহিঙ্গা ইস্যুকে বিশ্বায়ন করতে চাইছে পাকিস্তান। এর একটি অন্যতম কারণ হলো এইভাবে এল ই টি রোহিঙ্গা জেহাদিদের ভর্তির মাধ্যমে নিজেদের জঙ্গিদের সংখ্যা বাড়াতে চাইছে এবং পূর্বদিকে তাদের কাজে লাগাতে চাইছে।

(লেখক প্রবীণ সাংবাদিক)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

সন্ত্রাসবাদের রাজনীতি না রাজনীতির সন্ত্রাসবাদ

ভাস্কর ভট্টাচার্য

বিগত ৩০ জুলাই মুম্বই বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত (১৯৯৩ সালের বিস্ফোরণ) ইয়াকুব মেমনের ফাঁসি নিয়ে ভারতবর্ষের কিছু প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে আলোড়ন তৈরি হয়। এই ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন বৃন্দা কারাট, দিগ্বিজয় সিংহের মতো বামপন্থী ও কংগ্রেসের নেত্রী ও নেতা। তাঁরা এই ফাঁসির বিরোধিতা শুধু করেননি, সুপ্রিম কোর্টের এই আদেশের সঙ্গে সহমতও নন। কারণ ফাঁসি দেওয়া নাকি মানবাধিকারের বিরুদ্ধে একটি ব্যবস্থা। এর বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া উচিত।

শুধুমাত্র ভারতেই এই ধরনের জাতীয়তাবিরোধী, অপরিণামদর্শী বক্তব্য আমরা দেখতে পাই যা বিস্ময়কর। বিভিন্ন দূরদর্শন চ্যানেলে দিবারাত্র এই নিয়ে তর্ক অব্যাহত জনমত সংগঠনের জন্য। যদিও লেখকের মনে হয় তা শুধুমাত্র অনুষ্ঠানের টিআরপি বাড়ানোর জন্য যাতে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন বাবদ আয় আরো বাড়ে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শাস্তির বিধান একটা সভ্য দেশে প্রয়োজন কিনা। সেই শাস্তি যদি চরম হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য কিনা সমাজের জন্য। শাস্তির প্রকারভেদ অপরাধের মাত্রার ওপর নির্ভরশীল। প্রথমত, শাস্তির বিধান না থাকলে অপরাধের প্রবণতা বাড়ে যখন একটা রাষ্ট্রে ১২০ কোটি জনসংখ্যার চাপ। যখন সেই রাষ্ট্র বেকারত্বের শিকার। বেশিরভাগ মানুষকে সরকার নূন্যতম রোজগার দিতে, শিক্ষা দিতে, স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে ব্যর্থ। স্বাধীনতার ৬৮ বছর পর যখন আমরা দেখি দেশে মাওবাদের আড়ালে, সন্ত্রাসবাদের আড়ালে বেকার যুবকদের প্রলোভন দেখিয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার প্রবণতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। যখন দেখি ইসলামি মৌলবাদী সন্ত্রাস গোটা পৃথিবীকে ক্রমেই গ্রাস করতে চলেছে ইসলামিক স্টেট তৈরির লক্ষ্যে এবং তাদের সহযোগীরা তা করছে বিভিন্ন পড়শি দেশের মৌলবাদী ও গোয়েন্দা দপ্তর দেশের সেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে। দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে নৃশংসতার মাধ্যমে তারা একটা ভীতির সঞ্চার করছে। তাই সাধারণ মানুষের জীবন এবং তাদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার্থে অপরাধের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান যে প্রয়োজন তা একজন অশিক্ষিত মানুষও বুঝতে পারে।

মুম্বই হামলায় যে ২৫০ জনের বেশি সাধারণ মানুষের মৃত্যু যা প্রায় সমগ্র দেশের সুরক্ষাকে প্রশ্নচিহ্নের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, সেই অপরাধের শাস্তি কী হবে তা আদালত গ্রাহ্য। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারের জন্য সেই সন্ত্রাসবাদীকে সুযোগ দেওয়া হলো কিনা, তা দেখার দরকার মানবাধিকার কমিশনের। সর্বোচ্চ আদালতের রায় যদি ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হয় তবে ধরে নিতে হবে সেটাই সঠিক বিচার। ভারতবর্ষ বলেই কোটি কোটি টাকা খরচ করে আজমল কাসব, ইয়াকুব মেমন, আফজল গুরুর মতো সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত ভারত বিরোধী চক্রান্তকারীদের জন্য বছরের পর বছর মামলা চলেছে সাধারণ মানুষের করের টাকায়।

সমস্ত তদন্তের পর এটা স্পষ্ট যে মুম্বই বিস্ফোরণের পিছনে যেমন প্রধান মাথা ছিল দাউদ ও টাইগার মেমন, তেমনি তার ভাই ইয়াকুব মেমনের প্রাসঙ্গিকতা কিছু কম ছিল না। সন্ত্রাস যারা ঘটালো, দেখা যাচ্ছে অনেকেই আমাদের দেশের মধ্যে থেকে এই ইসলামিক এদের সহায়তা করেছে এবং ইয়াকুব প্রত্যক্ষ ভাবে তাদের অস্ত্র আনা, অস্ত্র পাঠানো, তাদের থাকার ব্যবস্থা করা, নিরাপত্তা দেওয়া, অর্থের যোগান দেওয়া ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ছিল। অর্থাৎ দেশের মধ্যে এই নারকীয় হত্যালীলার সেও একজন অংশীদার। সুতরাং উচ্চ ন্যায়ালয় সবদিক বিচার করে নজিরবিহীন অপরাধের জন্য যে সর্বোচ্চ সাজা ঘোষণা করেছে তা অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত।

অথচ এই সব দেশীয় বুদ্ধিজিবীদের কিছু অংশ এবং কংগ্রেস, সিপিএমের মতো বিদেশি দালালদের চোখে সন্ত্রাসের বলি সেই সব নিরীহ মৃত মানুষদের চোখের জলের কোনো মূল্য নেই। শুধু সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ককে তাদের পক্ষের বার্তা দেবার জন্য এবং ইসলামি স্টেট, তালিবান, হিজবুল মুজাহিদিন, লস্কর-এর মতো জঙ্গিদের সঙ্গে আঁতাতকারী দাউদ ও টাইগার মেমনকে আড়াল করার জন্য যে নোংরা রাজনীতির খেলায় মেতেছে তা দেশদ্রোহিতার থেকে

ললিত মোদীকে ভিসা পাওয়ানোর দায়ে সুষমা স্বরাজের পদত্যাগের দাবিতে মুখর কংগ্রেস এবং সিপিএম-এর বৃন্দা কারাট, সীতারাম ইয়েচুরি, দিগ্বিজয় সিংহ দেশের বিচার- ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রূপ মন্তব্যের জন্য পদত্যাগ করবে না কেন? সাংসদদের দায়িত্ব নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদান। সবকটি ঘটনা কংগ্রেসের আমলে ঘটেছে। এই দায়বদ্ধতার গাফিলতির জন্য তাদের শাস্তি হবে না কেন তাও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

কিছু কম বলে ভারতবাসী মনে করে না।

ললিত মোদীকে ভিসা পাওয়ানোর দায়ে সুষমা স্বরাজের পদত্যাগের দাবিতে মুখর কংগ্রেস এবং সিপিএম-এর বৃন্দা কারাট, সীতারাম ইয়েচুরি, দিগ্বিজয় সিংহ দেশের বিচার- ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রূপ মন্তব্যের জন্য পদত্যাগ করবে না কেন? সাংসদদের দায়িত্ব নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদান। সবকটি ঘটনা কংগ্রেসের আমলে ঘটেছে। এই দায়বদ্ধতার গাফিলতির জন্য তাদের শাস্তি হবে না কেন তাও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

এবার দেখা যাক, কঠোরতম শাস্তির প্রয়োজন এখন ভারতবর্ষের মতো দেশে থাকা উচিত কিনা। আগে আমাদের প্রতিরক্ষার জন্য ট্যাঙ্ক, মেশিনগান ইত্যাদি ছিল প্রধান অস্ত্র। কিন্তু বর্তমানে প্রতিবেশী দেশগুলি তাদের অস্ত্রভাণ্ডার অত্যাধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত করায় এবং পারমাণবিক শক্তি সঞ্চয় করায় ভারতকেও পারমাণবিক শক্তিধর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। এখানে তো ওইসব নেতারা কখনো প্রশ্ন তোলেননি যে এই সব মারণাস্ত্র যা সাধারণ নাগরিকের জীবন নেবে যুদ্ধ হলে, কোটি কোটি টাকা খরচ করে তা কেনা হচ্ছে কেন? এটা মানবাধিকারের বিপক্ষে— বলতে পারেনি, কারণ এই অস্ত্র কিনতে যেমন তাদের পকেট ভরেছে তেমনি এর সঙ্গে আলাদা করে কোনো সম্প্রদায় জড়িত নয় যা তাদের ভোটব্যাঙ্ককে ক্ষতি করতে পারে।

প্রকৃতির এটাই নিয়ম যে শত্রু শক্তিশালী হলে আমাদেরও ততোধিক শক্তিশালী হতে হবে। ঠিক সেইরকম অপরাধের ব্যাপ্তি যত বেশি হবে, সাজার মাত্রাও ঠিক ততটাই হওয়া প্রয়োজন। কথায় আছে 'শক্তের ভক্ত'। আজ ইউরোপ, আমেরিকা ভয় পাচ্ছে ইসলামিক স্টেটকে, কারণ তারা নৃশংসতার এক ভয়াবহ রূপ হয়ে উঠেছে তাদের সামরিক শক্তি বলে।

আমাদের তৈরি হতে হবে এই সব শক্তির বিরুদ্ধে লড়ার জন্য। তারা সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে আমাদের ঘরের মায়েদের, বোনেদের, মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে খেলা করবে। আমাদের সৈন্যদের বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে হত্যা করবে আর আমরা তাদের ধরে কোটি কোটি টাকা খরচ করে, বছরের পর বছর কারাগারে রেখে জামাই আদর করব— ফাঁসি দেব না ফাঁসি তুলে দেব— তা হয় না। যারা এই নৃশংসতা করছে তারা মানুষ নয়, শয়তান। শয়তানের জন্য কিসের মানবাধিকার!

কংগ্রেসের জওহরলাল নেহরুর জন্য কাশ্মীর সমস্যার সৃষ্টি এবং দেশ ভাগ হয় ধর্মের ভিত্তিতে। অথচ কিছু মুসলমানকে সেই সময় ভারতে স্থান দেবার জন্য আগামী দিনে আবার বিভাজনের দিকে এগোচ্ছে ভারত। ১৯৪৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে ২ লক্ষের বেশি হিন্দু নিধনের বিপক্ষে জ্যোতি বসু এবং তাঁর বামদল সুরাবার্দির বিরুদ্ধে একটা শব্দ খরচ করেনি। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের মানুষ তা দেখেছে যা আজকের প্রজন্মের কাছে অজানা।

আমরা যারা ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়াই তারা কি দেখছেন না এই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আজকের মুসলমান সমাজ, যাদের আমরা ভারতীয় বলে গ্রহণ করেছি তারা এর বিরুদ্ধে একটা শব্দ উচ্চারণ করছে? ভারত যদি তাদের দেশ হয়, ভারতের খেয়ে পরে তারা যদি বেঁচে থাকে তবে দেশভক্তির নমুনা হিসাবে পীরজাদা ত্বহাসিদ্দিকি সাহেব, দিল্লীর ইমাম সাহেবরা কেন এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে না। কেন রাস্তায় মিছিল করছেন না। বৃন্দা কারাতরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন না কেন। আসলে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক শত-বিভক্ত, তারা জানে। তাদের তোয়াজ না করলেও তারা ভোট দেবে। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়কে তোয়াজ করো, কারণ হিন্দু আগামীদিনে সংখ্যালঘু হলেও এরাই তো ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখবে! দেশ জাহান্নামে যাক। ওদের ক্ষমতার গদি যেন হাতছাড়া না হয়। আজ তৃণমূল কংগ্রেসও সিপিএম-এর দেখানো পথে চলছে। পশ্চিমবঙ্গ সন্ত্রাসবাদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে, খাগড়াগড় থেকেই আমরা বুঝতে পেরেছি। সমুদ্রগড়ে (বর্ধমান জেলা) হিন্দু নিধন, দেগঙ্গায়, নলিয়াখালিতে হাসান ইমরান নামক সাংসদের (তৃণমূলের) প্রত্যক্ষ মদতে হিন্দু নিধন শুরু হয়ে গেছে। মুর্শিদাবাদ, মালদার বেশ কিছু গ্রামে শাঁখ বাজানো নিষিদ্ধ হচ্ছে, এগুলো কিসের আগাম সঙ্কেত তা আমরা এখনো বুঝতে পারছি না।

এর পরেও ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যদি সাধারণ মানুষ সোচ্চার না হয়, ভোটব্যাঙ্কে তার প্রতিফলন না ঘটায় তবে এইভাবেই ইয়াকুব মেমনরা ভারতের মাটিতে সন্ত্রাস চালিয়েও শেষ শবযাত্রায় লক্ষ লক্ষ মানুষকে সামিল করবে যারা তার আত্মীয় নয়, বন্ধুও নয়, বরং তারা তার কৃতকর্মের জন্য আনন্দিত, উৎসাহিত। আসছে শরিয়তি আইন আগামীদিনে পৃথিবীকে শাসন করার জন্য। তার জন্য মিরজাফরের দল নখ, দাঁত বের করে আছে। ত্রিপুরার রাজ্যপালের বক্তব্যকে কদর্যতার সঙ্গে মানুষের সামনে ব্যাখ্যা দেশদ্রোহিতারই সামিল।

(লেখক আইনজীবী)

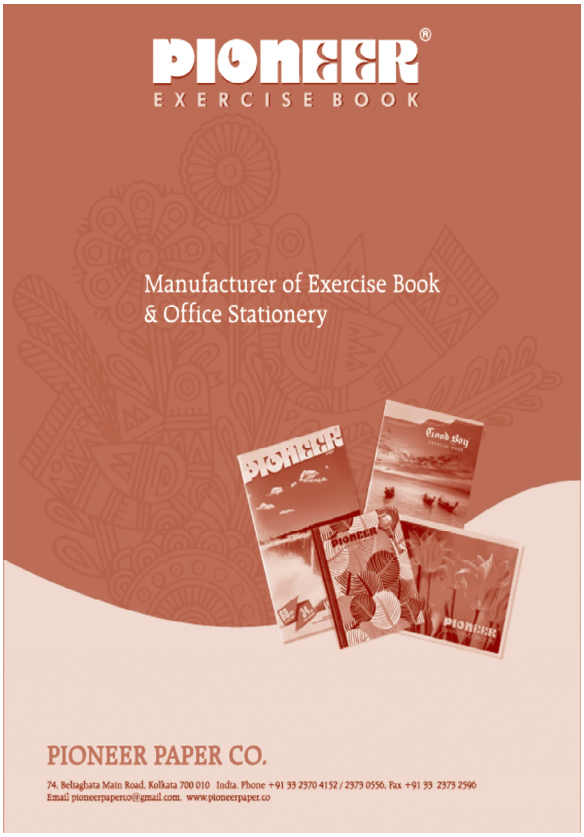

শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ফের মুখ পুড়ল রাজাপক্ষের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এ বছরের গোড়ায় জানুয়ারি মাসেই শ্রীলঙ্কার জনগণ তাঁদের রায় স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। যার জেরে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট থেকে সরতে হয়েছিল মাহিন্দা রাজাপক্ষকে। রাষ্ট্রপতি পদে বসেছিলেন মৈত্রীপালা সিরিসেনা। শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধে ৮০ হাজার মানুষের মৃত্যু, যার মধ্যে নিরীহ নাগরিকের সংখ্যাই প্রায় ৪০ হাজারের কাছাকাছি, সেদেশের মানুষ যে ভালোভাবে

> **গৃহ-যুদ্ধোত্তর পর্বে শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণগুলি চিহ্নিত করে সেগুলিকে নির্মূল বা কমপক্ষে হ্রাস করার চেষ্টাই প্রথম কাজ। প্রথম ও প্রধান কাজ সেদেশের তামিল জনগোষ্ঠীকে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সসম্মান শরিক করে নেওয়া।**

নেননি তা গত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তবুও ক্ষমতার শখ মেটেনি রাজাপক্ষের। এবার দাঁড়িয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হয়ে। আর তাতেই মুখ পুড়ল তাঁর। ভোটের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে রনিল বিক্রমসিঙ্ঘের ইউ এন পি ৯৩টি এবং রাজাপক্ষের ইউপিএফএ ৮৩টি আসন পেয়েছে।

এখন প্রশ্ন, রাজাপক্ষের বিরুদ্ধে সে দেশের মানুষের এই তীব্র অসন্তোষ কেন? প্রথমত, গৃহযুদ্ধকে ঠিকমতো সামাল দিতে না পারার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে। শ্রীলঙ্কার তামিলদের কাছে তিনি একপ্রকার খলনায়কে পরিণত হয়েছেন। উলটোদিকে সিংহলীদের কাছে তাদের মুখ হয়ে ওঠার যে প্রয়াস তিনি এর মধ্যে দিয়ে করতে চেয়েছিলেন তাও একপ্রকার ব্যর্থই হয়েছে

রনিল বিক্রমসিঙ্ঘে

মৈত্রীপালা সিরিসেনা

বলা চলে। কারণ রাজাপক্ষের বর্বরতা ও ঔদ্ধত্য অনেক সিংহলীর কাছেই অসহনীয় ঠেকেছিল। দ্বিতীয়ত, আর্থিক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ এবং প্রশাসনের দীর্ঘসূত্রতা ও কাজে গাফিলতি রাজাপক্ষকে শ্রীলঙ্কার জনগণ থেকেই একপ্রকার দূরবর্তী করে দেয়।

গৃহ-যুদ্ধোত্তর পর্বে শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণগুলি চিহ্নিত করে সেগুলিকে নির্মূল বা কমপক্ষে হ্রাস করার চেষ্টাই প্রথম কাজ। প্রথম ও প্রধান কাজ সেদেশের তামিল জনগোষ্ঠীকে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সসম্মান শরিক করে নেওয়া। উত্তর ও পূর্ব শ্রীলঙ্কার তামিল প্রধান অঞ্চলের স্বশাসনই তার প্রধান শর্ত। একথা বলেই ক্ষমতায় আসার কিছুদিনের মধ্যেই সিরিসেনা সংবিধান সংশোধনের সাহস দেখিয়েছেন। এই সংশোধন রাষ্ট্রনায়কের স্বৈরাচার ও একনায়কতন্ত্রের পরিপন্থী বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সর্বোপরি সিংহলী মুখের যে ইমেজ বা ধ্যানধারণা রাজাপক্ষে তৈরি করেছিলেন তাকে ভাঙতেও তিনি সক্ষম হয়েছেন এবং একইসঙ্গে শ্রীলঙ্কায় তামিল বনাম সিংহলীদের দীর্ঘদিনের গৃহযুদ্ধেরও যাতে অবসান হয় সে ব্যাপারে যথেষ্ট ইতিবাচক পদক্ষেপ তিনি নিয়েছেন বলেই মনে করছেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

রাজাপক্ষে-যুগের অবসানের পর সিরিসেনার আমলে শ্রীলঙ্কার বিদেশ-নীতিতেও ভালো রকমের পরিবর্তন এসেছে এবং সেটা ভারতেরই অনুকূলে। রাজাপক্ষে তাঁর আমলে চীন-কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। চীনও সুযোগ বুঝে প্রতিবেশী ভারত-কে (বিশেষ করে তামিলনাড়ু সন্নিহিত অঞ্চলে) অশান্ত করতে শ্রীলঙ্কা-কে কাজে লাগিয়েছিল। গৃহযুদ্ধের মধ্যে পরে চীন যে শুধু ৫ বিলিয়ন ডলার শ্রীলঙ্কাকে ধার দিয়ে সাহায্য করেছিল তাই নয়, সড়ক ও টেলিকমের মতো ক্ষেত্রে যুদ্ধের পরে যথেষ্ট অনুদানও চীন শ্রীলঙ্কাকে দিয়েছিল। পুরো বিষয়টিকেই অস্বচ্ছ লেনদেন বলে কূটনৈতিক মহল মনে করেছেন।

যদিও সিরিসেনা সরকার ১.৪ বিলিয়ন ডলারের বন্দর শহর গড়ার চীনা-প্রস্তাবে কাজে নেমেছে কিন্তু এটি শুধুমাত্র শ্রীলঙ্কার স্বার্থেই ব্যবহৃত হবে বলে তিনি ঘোষণা করেছেন। এদেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর জমানায় যে সকল কূটনৈতিক দৌত্যের নজির রেখেছেন শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হবে না বলেই কূটনীতিজ্ঞরা মনে করছেন। ∎

আইন কী বলে এবং যা হওয়া উচিত

দেবাংশু ঘোড়ই

“একটি বিবাহিত দম্পতির জীবনে সবথেকে সুন্দর মুহূর্ত হলো তাঁদের কোলে যখন একটি সন্তান আসে তা সে যত কষ্টের মধ্যেই আসুক না কেন...।” ঠিক এরকমভাবেই কল্পনা পালের বিচারের রায় দেওয়া শুরু করেছিলেন মাননীয় বিচারপতি শ্রী দীপঙ্কর দত্ত মহাশয়। এরপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে কিন্তু বেশিরভাগ বয়স্ক মা-বাবার অবস্থা সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। তা হলো একটি সময়ের পর তাঁদের স্থান হয়েছে ‘বৃদ্ধাশ্রম’ নামক একটি জায়গায়। আমরা প্রায়ই বিভিন্ন দৈনিকে বয়স্কদের সমস্যা নিয়ে লেখালিখি দেখতে পাই। বলতে বাধা নেই প্রত্যেকটি লেখাই মনকাড়া এবং যথারীতি প্রশংসার দাবি রাখে। আবার পাশাপাশি এটাও বলতে হয় যে, খুব কষ্টও লাগে এই সমস্ত লেখাগুলি পড়ে। সত্যিই তো কাল যাঁরা আমাদেরকে দেখাশোনা করেছেন, লালন-পালন করেছেন, বড় করেছেন, সমাজে মেশার যোগ্য করে তুলেছেন আজ তাঁরাই কিনা ব্রাত্য। একেই বোধহয় বলে ভাগ্যের পরিহাস! আমি সম্প্রতি এই বিষয়ের উপর বেশ কিছু লেখা পড়েছি এবং সবথেকে হৃদয়বিদারক লেখাটি হলো, যেখানে বৃদ্ধ মা-বাবাকে এয়ারপোর্টে বসিয়ে রেখে তাঁদের ছেলে বিদেশে পালিয়ে যায় সেই দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে। ছিঃ ছিঃ...কী অকৃতজ্ঞ এইসব ছেলেমেয়েরা!

এবার বেশ কিছু আলোচনায় আসি যেগুলো এইসব বয়স্ক মানুষদের জন্য ভীষণ দরকারি। যদিও বয়স্কদের কথা মাথায় রেখে ভারত সরকার একটি আইন তৈরি করেছে যেটি ‘The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007’ নামে পরিচিত এবং যেখানে সাব-ডিভিশনাল স্তরে একটি ট্রাইব্যুনাল তৈরি করে এই সমস্ত বয়স্ক মানুষদের সুরাহা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবুও বলব আইনটিতে অনেক ফাঁক রয়ে গেছে বিশেষ করে এই জাতীয় ছেলেমেয়েদের কথা মাথায় না রাখার জন্য। The Code of Criminal Procedure, 1973-এর ১২৫ ধারায় যদিও ভরণপোষণ ও খোরপোশের কথা বলা হয়েছে তবুও স্পেশাল আইন হিসেবে আমার ব্যক্তিগত মতামত ২০০৭ সালের আইনটিকে আরও কড়া করা উচিত বিশেষ কতকগুলি কথা মাথায় রেখে। কোনো অপরাধী যখন দেশের ভেতর কোনো অপরাধ করে বিদেশে পালিয়ে যায় তার জন্য যেমন ১৯৭৩-এর আইনে ১৬৬ ধারা রয়েছে, সেরকমই ২০০৭ সালের আইনেও বিশেষ ধারার সংযোজন করা উচিত সেইসব ছেলেমেয়েদের জন্য যাঁরা তাঁদের বৃদ্ধ মা-বাবাকে দেশে ফেলে রেখে বিদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে চলে যান। এটাও কোনো মারাত্মক অপরাধের চেয়ে কম কিছু নয়। আমার ব্যক্তিগত মত, এটা যে কোনো ফৌজদারি অপরাধের চেয়েও মারাত্মক। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত সব বৈদেশিক সরকারের সঙ্গেই এরম চুক্তি করা যাতে এধরনের কার্যকলাপের জন্য ওইসব ছেলেমেয়েদের বৈদেশিক নাগরিকত্ব বাতিল করা হয় এবং তার জন্য তাঁদের যথাযথ শাস্তিও পাওনা হয় অথবা এরকমও করা যায় যে তাঁরা যেখানেই থাকুক তাঁদের মাসিক বেতনের একটি বিশেষ অংশ তাঁদের মা-বাবার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ার পরই বাকি অংশটুকু যেন তাঁদের হাতে আসে। আর তবেই হবে সেই ছেলেমেয়েদের উচিত শিক্ষা।

এত গেল খোরপোশ বা ভরণপোষণের কথা। এরপরই যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল এইসব বয়স্কদের সুচিকিৎসার কথা। যদিও ২০০৭ সালের আইনে ধারা ২০ (ভি)-তে প্রতিটি জেলা হাসপাতালে জেরিয়াট্রিক সেন্টারের কথা বলা হয়েছে। আমার মনে হয়, বয়স্কদের যাতায়াতের কষ্টের কথা মাথায় রেখে আইনটিকে একটু সংশোধন করে এইসব বয়স্ক মানুষগুলোর জন্য এইসব জেরিয়াট্রিক সেন্টারগুলি পঞ্চায়েত স্তর থেকেই তৈরি করা উচিত যাতে তাঁদের কোনোরকম অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয়।

যদি আরও একটু এগোনো যায় তাহলে ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫১এ-তে যেসব ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস্-এর কথা উল্লেখ করা রয়েছে তাতেও একটু সংশোধনী আনা যায় অনায়াসে এইসব মানুষগুলোর কথা ভেবে। আমরা সবসময় আমাদের সাংবিধানিক অধিকারের কথা বলি অথচ সংবিধানে যেসব ডিউটির কথা বলা রয়েছে তার খুব সমান্যতম অংশই পালন করে থাকি। তাই এই ডিউটিগুলোতে যদি আর একটা ডিউটি যোগ হয় তবে মন্দ হয় না। যেমন—প্রতিটি সরকারি কর্মচারীকে প্রতি সপ্তাহে মাত্র একটি ঘণ্টা সময় বের করে যে কোনো নিকটবর্তী বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে সেখানকার বয়স্ক মানুষগুলোর সঙ্গে সময় কাটাতে হবে এবং বৃদ্ধাশ্রমের ওই বয়স্ক মানুষগুলোর রিপোর্ট ওই সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের সার্ভিস বুকে এবং বাৎসরিক কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্টে যোগ করা হবে এবং সেই অনুযায়ী তাঁদের পদোন্নতি হবে এবং বাৎসরিক মাহিনাও বৃদ্ধি পাবে। আমার মনে হয়, এই নীতিগুলো যদি নেওয়া যায় তাহলে এইসব বয়স্ক মানুষগুলোর একাকিত্ব বেশ খানিকটা লাঘব হবেই, উপরন্তু এঁদের মুখে হাসি ফোটাতেও আমরা খানিকটা সক্ষম হব।

(লেখক কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী। মতামত ব্যক্তিগত)

কবিতায় রবীন্দ্র-মূর্তি

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মাইক্রো রাইটিং নিয়ে আমাদের দেশে কাজের নমুনা বিরল। শিল্পনৈপুণ্যে ভরপুর পরিশ্রমসাধ্য এই কাজে খুব একটা কেউ এগিয়ে আসেন না। যদিও বা সে কাজ করতে কেউ আগ্রহী হয় তাহলে তা সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই। মাইক্রো রাইটিং-এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিকৃতির নবজন্ম হয়। সৃষ্টি হয় অপূর্ব শিল্পকৃতির। এরকমই এক মাইক্রো রাইটিং-এর স্রষ্টা মনমোহন মিশ্র। যিনি ২৮×২২ মাপের একটি কাগজে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির মোট ১৫৭টি কবিতা দিয়ে তৈরি করেছেন রবীন্দ্রনাথের এক আবক্ষ প্রতিকৃতি।

মনমোহন মিশ্র

অসমের শিলচরের অম্বিকাপট্টিতে বাস মনমোহন মিশ্রের। পেশায় সরকারি আধিকারিক মনমোহনবাবুর ছোট হরফে লেখার প্রবণতা শৈশব থেকেই। পাশাপাশি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়েও তাঁর অগাধ পড়াশোনা। তাঁর মনে হলো ছোট হরফে লেখার প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে কিছু একটা করার। এইরকম সময়ই তাঁর কানে ভেসে আসে শিলচর গান্ধীমেলায় এক শিল্পী সুপারির মধ্যে গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি লিখেছেন মাইক্রো রাইটিং-এ। তৎক্ষণাৎ তিনিও লেগে পড়লেন এরকমই কিছু একটা করতে। কিন্তু কাজ শুরুর আগে তিনি কী করতে চলেছেন তা কারোর কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেননি। পরবর্তীকালে জানা যায় গীতাঞ্জলির কবিতা যথাসম্ভব ছোট হরফে লিখে আরও এক নজির সৃষ্টি করতে চলেছেন মনমোহন মিশ্র।

কাজ শুরুর আগে তিনি ভাবেন মূল বাংলা গীতাঞ্জলির ১৫৭টি পুরো কবিতা তিনি লিখবেন। তবে কাজটা যতটা সহজ মনে করেছিলেন তা যে নয় হাতেকলমে করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন। তাঁর কাছে থাকা ১৭৭টি পাতায় ১৫৭টি কবিতার শব্দের পরিমাণ মোট ১১,৫৫২টি। কবিতার সংখ্যা এবং শব্দের পরিমাণ দেখে প্রথমে কিছুটা ঘাবড়ে গেলেও সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে তিনি কাজে হাত লাগান। একটি ড্রয়িং শিট কিনে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির স্কেচ তৈরি করলেন। কিন্তু সবকিছু ঠিকঠাক এগোলেও সমস্যা একটা দেখা দিল। রবি ঠাকুরের চুল-দাড়ি সব সাদা রঙের করতে গেলে কীভাবে তা ফুটিয়ে তোলা হবে তা নিয়ে তিনি ভাবতে থাকেন। অবশেষে তিনি নিজেই সমস্যার সমাধান করে ফেলেন। সাদা রঙের ড্রয়িং শিট বদলে গায়ের রঙের কাছাকাছি হলুদ রঙের ড্রয়িং শিট ব্যবহার করলেন। এরপর আঁকার কালি দিয়ে কাজ শুরু করেন।

মাইক্রো রাইটিং-য়ের ক্ষেত্রে প্রধান বস্তু ক্রো-কুইল এবং চাইনিজ ইংক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাদা চুল-দাড়ি বোঝাতে গেলে সাদা রঙের কালি চাই। অগত্যা সাদা ফ্রেব্রিক রং তিনি ব্যবহার করেন। তবে এই কাজের জন্য ফেব্রিক রং-য়ের ব্যবহার হয় না। তা সত্ত্বেও তাঁকে তা করতে হয়েছে। কারণ এই ১৫৭টি কবিতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি অঙ্কন করতে গেলে তা নির্ভুল করা জরুরি। এক্ষেত্রে কোনোভাবে ভুল হলে শোধরানো প্রায় অসম্ভব। ক্রো-কুইল দিয়ে ফেব্রিক রং নিয়ে একটি শব্দ লিখতে অন্তত দু'বার রঙে নিব চুবিয়ে নিতে হয়। এই কাজ করতে গিয়ে মনমোহনবাবুকে নানান চিন্তাভাবনা করতে হয়েছে। সব কিছু সামলে পুরো শিল্পকর্মটি শেষ করতে তাঁর প্রায় ২৫ দিন লেগেছে। একের পর এক কবিতাকে সারিবদ্ধ করে এমনভাবে সাজাতে হয়েছে দেখে মনে হবে সাজানো কবিতার মালা। কারণ এই কবিতার সারি দিয়েই রবিঠাকুরের যেমন চুল চোখ-কান ফুটে উঠেছে তেমনি এই ১৫৭টি কবিতার মাধ্যমেই কবিগুরুর সারা শরীরের অঙ্গকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সমস্ত সফলতার মধ্যে আনন্দ যেমন লুকিয়ে থাকে তেমনি অসম্পূর্ণতার মাত্রাও পিছু ছাড়ে না। এরকমই একটি ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে এক্ষেত্রে। তাঁর এই অসাধারণ সৃষ্টির ঠাঁই হয়েছে বর্তমানে অম্বিকাপট্টির সুসজ্জিত ফ্ল্যাটের ড্রইং রুমের দেওয়ালে। আক্ষেপ বলতে কিছুই নেই তাঁর। কিন্তু ২৮×২২ ইঞ্চি সাইজের মাইক্রো রাইটিং-য়ের রবীন্দ্রনাথের স্থান হওয়া উচিত ছিল কোনো মাইক্রো ক্যালিগ্রাফি সেন্টারে। দিল্লীর ন্যাশনাল গ্যালারি অব মর্ডান আর্ট-এর ক্রাফট মিউজিয়ামে গেলে তারা এই কাজের প্রশংসা করেন। কিন্তু তা সেখানে সংরক্ষণ সম্ভব নয় বলে ফিরিয়ে দেয়। কারণ এধরনের কাজকে মর্ডান আর্ট ফর্ম হিসাবে ধরা হয় না বলে তারা জানান। তবে বিস্মিত এবং মর্মাহত মনমোহন মিশ্র বলেন, ''মানুষ আমার কাজের প্রশংসা করেছেন এটাই আমার পুরস্কার। তবে আমি আর এটাকে হাতছাড়া করতে চাই না। তাই নিজের কাছেই রেখে দিলাম।'' রবীন্দ্রপ্রেমী মনমোহনবাবুর মতো এদেশে এরকম হাজার মাইক্রো রাইটারদের নাম তাই আজ তলানিতে এসে ঠেকেছে। কারণ তাঁদের তৈরি শিল্পকর্মটির স্থান তো কোথাও হয় না। তাই নতুন সৃষ্টির উৎসাহও তাঁরা হারাচ্ছেন। ■

ARE YOU SEARCHING FOR A PROPERTY PLANNER ?

PROPERTY

BUY SALE RENT

Contact

DILIP KUMAR JHAWAR 9831172945

RANAJIT MAZUMDAR 9339861465

S M WEALTH INFRAREALTOR LLP | 52 /E BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD, KOLKATA 700019
Email : info@smwealth.co | Web Link : www.smwealth.co

আকুপ্রেসার—প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি

ডাঃ পুষ্কর কুমার

আকুপ্রেসার প্রাচীন ভারতে মর্ম চিকিৎসা নামে পরিচিত। সুশ্রুত সংহিতায় এই পদ্ধতির বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে। মানবশরীরে রক্তবাহিকা নালী এবং স্নায়ুতন্ত্রগুলির শেষ ভাগ হাত ও পায়ে রয়েছে। যখন সম্পর্কিত অঙ্গে স্নায়ুর শেষ ভাগকে চাপ দেওয়া হয় তখন শক্তিপ্রবাহ সেই অঙ্গকে প্রভাবিত করে সেই অঙ্গের অসুবিধা দূর করে।

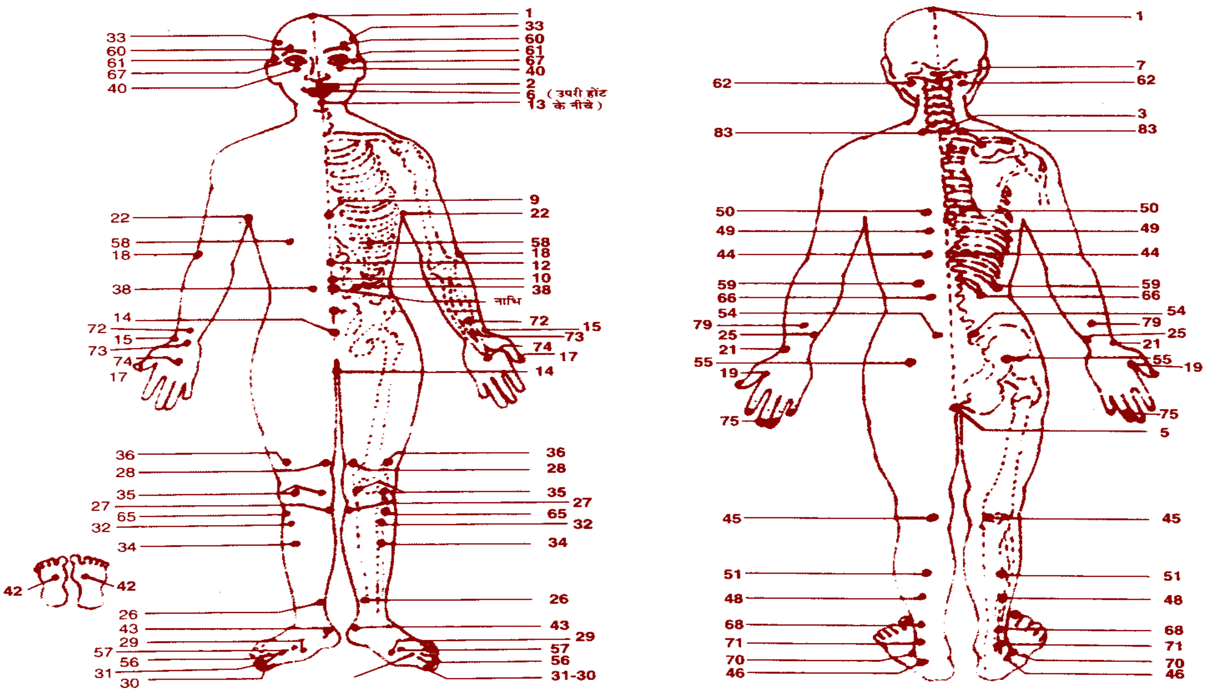

এই চিকিৎসায় রক্তচাপ, মাথাব্যথা, মানসিক চাপ, শোথ, সন্ধিবাত, পেট ব্যথা, বুক ভারীবোধ করা, লিভারের নানাপ্রকার রোগ দূর হতে পারে। সুস্থব্যক্তিও এই চিকিৎসার দ্বারা নীরোগ জীবনযাপন করতে পারেন। নিয়মিতভাবে করার ফলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের শুধু ক্ষমতাই বাড়বে না, নানা প্রকার অসুখ বিসুখ থেকেও মানুষ মুক্ত থাকতে পারবে।

বিভিন্ন রোগে যে বিন্দুতে চাপ দিতে হবে : (চিত্র দ্রষ্টব্য)

□ উচ্চ রক্তচাপ—চিত্রের বিন্দু অনুসারে সকাল-সন্ধ্যায় ৫ থেকে ১০ সেকেন্ড সময় ৭২, ৩২, ১৮, ২৬, ৫, ৫৭ এবং ৪৩।

□ নিম্নরক্তচাপ—১, ৮, ৩২, ২৬ এবং ২২।

□ মৃগী—১, ৪২, ৩১ ও ৭৫।

□ মাইগ্রেন—৩৩, ৬০, ৬১, ১৯, ৭২, ১৫, ৩২, ৫৭ ও ২৩।

□ মাথাব্যথা—১, ৬২, ৩৪, ৩২ ও ৫৬।

□ বুক ভারী বোধ করা—১, ৭২, ৭৯, ৫৮, ৫৯, ৬৫ ও ৬৬।

□ শোথ—১, ১০, ১১, ৪৪, ২৭ ও ২৬।

□ পেট ব্যথা—৩২, ৩৬ (১০ সেকেন্ডের বেশি), ১২, ৭২, ২৯, ৩৮, ৫৭, ৪৪।

□ মানসিক চাপ—১, ১৭, ৩০, ৭৩, ৪৬, ৭, ৩, ১৩, ৭৪, ৪ ও ১৮।

□ মায়কোপিয়া (দূরে দেখা অসুবিধার জন্য) ১, ৪০, ৪৭, ৬৭, ৬২, ৬০, ১৯, ২৫, ২১, ৬৮ ও ৪৮।

□ যকৃতের রোগ—৬৫, ৭৯, ৫৮, ৪৯, ৭০, ৫০, ৫৬ ও ২৬।

□ পেটে গ্যাস (খাবার হজম না হওয়ার ফলে)—১, ৪১, ৩৮, ৪৪, ৭০, ৫০, ৫৬ ও ২৬।

□ কোষ্ঠকাঠিন্য—১, ১৪, ৫৪, ৫৫, ৫, ৬, ২৬ ও ৫১।

যাঁরা উপরোক্ত রোগগ্রস্ত নন, তাঁরা যদি চিত্র দেখে সকাল-সন্ধ্যা ৫ থেকে ১০ সেকেন্ড ৪৩, ৮৩, ৬৫, ১৫, ৭১, ১২, ৫৯, ৫৭, ৭২, ৩, ১৮, ২৬, ৩২, ৫০ ও ৯ বিন্দুতে চাপ দিতে থাকেন তাহলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ সক্রিয় থাকবে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু :

কিডনি কার্যক্ষম রাখার জন্য ৪৩, হাড় শক্ত করার জন্য ৮৩, মাংসপেশী সুদৃঢ় করার জন্য ৬৫, রক্তপ্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ১৫, অস্থি-মজ্জা নির্মাণের জন্য ৭১, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র, মূত্রাশয়, পিত্তথলি, পেট কর্মক্ষম রাখার জন্য ১২, হৃদয়, ফুসফুস, কিডনি, লিভার, সুষুন্মাকাণ্ড কর্মক্ষম রাখার জন্য ৫৯, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের জন্য ৭২, শরীরে রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য—৩, ১৮, ২৬, ৩২, হিমোগ্লোবিন বৃদ্ধির জন্য ৫০, ফুসফুস শক্তিশালী করার জন্য ৫০ বিন্দুতে চাপ দিতে হবে।

সাবধানতা :

□ শুধুমাত্র সকাল ও সন্ধ্যায় করতে হবে।

□ খাওয়ার ১ ঘণ্টা আগে অথবা ১ ঘণ্টা পরে করতে হবে।

□ অঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে চাপ দিতে হবে।

ফঃ ৫

ভগিনী নিবেদিতার বাগবাজারের বাসস্থান অধিগ্রহণের সভা

ভগিনী নিবেদিতার কলকাতায় বাগবাজারে ১৭ বোসপাড়া লেন-এর বাসস্থান-কে সরকারিভাবে ঐতিহ্যশালী স্থান হিসেবে ঘোষণা এবং অধিগ্রহণের দাবিতে গত ১৮ আগস্ট বিকেলে একটি কনভেনশন হয়ে গেল। উদ্যোক্তা রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার (গোলপার্ক) এবং সিস্টার নিবেদিতা হেরিটেজ কমিটি। ভগিনী নিবেদিতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কমিটির পক্ষে প্রথমে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ। প্রধান অতিথি রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর অনুপস্থিতিতে তাঁর দেওয়া চিঠি পাঠ করা হয়।

ইন্সটিটিউট অব কালচারের বিবেকানন্দ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা, কালচার-এর সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দজী এবং বাগবাজারে মায়ের বাড়ি-র অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বনাথানন্দজি। তাঁরা প্রত্যেকেই ভগিনী নিবেদিতার অবদানের কথা বর্ণনা করে ১৭নং বাড়িটিকে ঐতিহ্যশালী স্থান হিসেবে ঘোষণা ও অধিগ্রহণের দাবিকে সমর্থন করেন। উল্লেখ্য, ১৯০২-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯১১-র অক্টোবর পর্যন্ত ভগিনী নিবেদিতা এই বাড়িতেই থাকতেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক অসীম মিত্র। অপর আহ্বায়ক রন্তিদেব সেনগুপ্ত কমিটির কাজকর্ম সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। পরে উপস্থিত শ্রোতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ হয়।

ল-ক্লার্ক পরিষদের প্রথম রাজ্য সম্মেলন

গত ৮ আগস্ট কলকাতার ভারতসভা হলে বঙ্গীয় ল-ক্লার্ক পরিষদের প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষের প্রারম্ভে অন্ত্যোদয় যোজনা অনুসারে এই সংগঠন সারা রাজ্য ল-ক্লার্কদের সংগঠিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। আদালতের পরিকাঠামোয় ল-ক্লার্ক-রা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পরিশ্রমী ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও সর্বাপেক্ষা অবহেলিত। ইতিপূর্বে ল-ক্লার্কদের নিয়ে গঠিত সংগঠনগুলি শাসকদল এবং মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থসিদ্ধির কেন্দ্র হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। অথচ তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে ল-ক্লার্কদের কেন্দ্রীয় সরকারের পেনশন ও বীমা যোজনার আওতায় নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মনোজ দুবে সভাপতিত্ব করেন। বক্তা ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্রের সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী। বক্তব্য রাখেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দীলিপ ঘোষ এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি লিগ্যাল অ্যান্ড লেজিসলেটিভ সেলের রাজ্য কনভেনর আইনজীবী সমীর পাল। অনুষ্ঠানে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণ অনুষ্ঠান সারা বৎসর ব্যাপী আদালত চত্বরে পালনের অঙ্গীকার করা হয়। আগামী সম্মেলন বারাসাতে হওয়ার কথা ঘোষণাও করা হয়েছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রধান ল-ক্লার্ক মদনমোহন গোস্বামী ও কার্তিক ঘোষ। অনুষ্ঠানে মহিলা প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

সীমা জনকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ভারতমাতাপূজা

গত ১৪-১৫ আগস্ট দক্ষিণবঙ্গ সীমা জনকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় ভারতমাতাপূজা ও অখণ্ড ভারত দিবস।

মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা বিশ্বনাথপুর, জলঙ্গী সিংপাড়া, রাণীনগর মোহনগঞ্জ; নদীয়া জেলার চাঁপড়া ও চাঁদেরহাট; উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গেড়াপোতা ও চাঁদাগ্রাম, গাছা ও গোয়ালদা সীমান্তে ভারতমাতার মূর্তি-সহ বিধিসম্মত পূজা হয়। এই উপলক্ষে অসংখ্য স্থানীয় গ্রামবাসী ও সীমা সুরক্ষা জওয়ান স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সকল পূজা স্থলেই 'সীমা সচেতন সভা' অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির কর্মীদের বহু বাড়িতে উৎসাহ সহকারে ভারত মাতার ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে পূজা হয়। কোনো কোনো শক্তিকেন্দ্রের কর্মীরা বাংলাদেশ সীমা দর্শন করেন।

যাদবপুর শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সমিতির ‘অখণ্ড ভারত দিবস’ উদ্‌যাপন

গত ১৫ আগস্ট যাদবপুর নবনগর পার্ক সংলগ্ন অঞ্চলে ‘অখণ্ড ভারত দিবস’ পালন করা হয় যাদবপুর শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সমিতির উদ্যোগে। সকাল ৯.৩০ মিনিটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানটির শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ। অনুষ্ঠানে অন্যতম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী শর্বরী মুখার্জী। স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের মাধ্যমে কীভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ একে একে বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্তমান খণ্ডিত চেহারা নিয়েছে তা ব্যাখ্যা করেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ‘যাদবপুর শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সমিতির’ সাধারণ সম্পাদক দিবাকর পাল। অনুষ্ঠানে এলাকার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সংস্কৃতভারতীর দেশব্যাপী একদিনের সম্পর্ক অভিযান

সংস্কৃত ভাষাকে জনমুখী ভাষা করার উদ্দেশ্যে গত ২৩ আগস্ট দেশব্যাপী বাড়ি বাড়ি সম্পর্ক অভিযান করে সংস্কৃত ভারতী। কোনো একটি ভাষার প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে একরকম একদিনের অভিযানে সহস্রাধিক সংস্কৃতপ্রেমী কার্যকর্তা লক্ষ লক্ষ বাড়িতে গিয়ে সম্পর্ক অভিযানে অংশগ্রহণ করলেন সম্ভবত এই প্রথম। সংস্কৃত ভাষার প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ বা তাঁদের মতামত জানার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত ভারতী সংস্কৃতপ্রেমী কার্যকর্তাদের কাছে সম্পর্ক অভিযানের জন্য একদিনের সময় দানের আহ্বান জানান। সেই অনুসারে গত ২৩ আগস্ট রবিবার সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত অভিযান চলে। বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় ২/৩ জন সংস্কৃতপ্রেমী কার্যকর্তা প্রত্যেক বাড়িতে একটি হ্যান্ডবিল ও ‘বদতু সংস্কৃতম্’ পুস্তক দিয়ে পরিবারের সকলকে সংস্কৃত পড়ার বা বলার আগ্রহ করেন। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে দক্ষিণবঙ্গের ৫/৬টি জেলায় এই অভিযানে অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছে। এর মধ্যে অন্যতম জেলাগুলি হলো— বর্ধমান, নদীয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া ও কলকাতা। অনেক মানুষ আনন্দে ‘বদতু সংস্কৃতম্’ পুস্তক কিনেছেন এবং সাগ্রহে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ‘পত্রাচার দ্বারা সংস্কৃতম্’ পাঠ্যক্রমের ছাত্র হয়েছেন। সম্পর্ক অভিযানের দলে ছিলেন বালক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। দক্ষিণবঙ্গে প্রায় সব মিলিয়ে ৩৩২ জন কার্যকর্তা ৮ হাজার ৫৫৫টি বাড়িতে গিয়ে সম্পর্ক করেন বলে সংস্কৃত ভারতীর সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ জানিয়েছেন। এছাড়া আগামী ২৬ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর সংস্কৃত সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্যে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রতিযোগিতামূলক সংস্কৃত কার্যক্রমের উদ্যোগে নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে, সারাদেশে ৩ হাজার ২১৩ স্থানে ২৩ হাজার ৩৭৭ জন কার্যকর্তা ৪ লক্ষ ২৪ হাজার ২০৪টি বাড়িতে সম্পর্ক করেছেন। বদতু সংস্কৃতম্ পুস্তক বিক্রয় হয়েছে ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ১০৮টি এবং পত্রাচার দ্বারা সংস্কৃতম্ ছাত্র হয়েছেন ২৮৮৭ জন।

মঙ্গলনিধি

গত ৯ আগস্ট বাঁকুড়া জেলার খাতড়া নগরের স্বয়ংসেবক অচ্যুতানন্দ ঘোষ তাঁর কন্যা ব্রততীর শুভবিবাহ উপলক্ষে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন বাঁকুড়া জেলা কার্যবাহ তরুণ লায়েকের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খাতড়া মহকুমা বৌদ্ধিক প্রমুখ সুভাষ দত্ত, জেলা প্রচারক ভীষ্মদেব মণ্ডল-সহ বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা।

ভারতের স্বাধীনতা ও উদ্বাস্তু সমস্যা

সুকুমার সিকদার

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে প্রতি বৎসর এই দিনটিকে আমরা স্বাধীনতা দিবস হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করে আসছি। দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য বীর বিপ্লবীদের গৌরবজ্জ্বল সংগ্রাম, অফুরন্ত আত্মত্যাগ, অসংখ্য প্রাণ, নারীর সম্ভ্রম, রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতার কথা আমরা স্মরণ করি ও বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি। কিন্তু আমরা তাদের কথা স্মরণে রাখিনি যাদের দেশত্যাগের বিনিময় এই স্বাধীনতা। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ ও স্বাধীনতা লাভের জন্য পূর্ববঙ্গের অসংখ্য সংখ্যালঘু হিন্দু বাধ্যতামূলকভাবে জন্ম-জন্মান্তরের পিতৃপুরুষের ভিটা মাটি থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল। যাদের মধ্যে অধিকাংশ উদ্বাস্তু স্বাধীনভারতের মাটিতে পরাধীনতার গ্লানি নিয়ে অধিকারবিহীনভাবে এখনও বসবাস করছে। সে ইতিহাস আমরা ভুলে গেছি। আজও তারা নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। কি অপরাধে তাদের এই পরিণতি? স্বাধীনতার ইতিহাসের এই অধ্যায়টি নতুন প্রজন্মের জন্য প্রয়োজন।

তৎকালীন মুসলিম লীগের দাবি অনুযায়ী দেশভাগ না হলে ভারত স্বাধীন হোত না। এটাই ছিল তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মূল বক্তব্য। তাই বলতে পারি দেশ ভাগের ফসল হলো স্বাধীনতা আর স্বাধীনতার ফসল হলো উদ্বাস্তু সমস্যা। স্বাধীনতা লাভের ৬৮ বৎসরেও উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হলো না। আমার মনে হয় পৃথিবীর ইতিহাসে এত দীর্ঘায়িত অমীমাংসিত সমস্যা দ্বিতীয়টি নেই।

তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্বপাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) সংখ্যালঘুদের উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজনে। তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্রুতি ছিল উদ্বাস্তুরা দেশভাগের শর্তানুযায়ী ভারতের নাগরিকত্ব পাবে। উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান ছিল স্বাধীনতার অসমাপ্ত কাজ। কিন্তু সেই অসমাপ্ত কাজ ৬৮ বৎসরেও সমাপ্ত হলো না।

মানুষগুলো সাম্প্রদায়িক দেশভাগের তথা স্বাধীনতার জন্য নিজ মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছে শুধু সংখ্যালঘু হওয়ার অপরাধে। কোটি কোটি মানুষ নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসে স্বাধীন ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ক্ষমতা ভাগাভাগির স্বাধীনতায় কি পেয়েছেন তারা? এদেশের বিভিন্ন প্রান্তে দীর্ঘকাল ধরে অধিকাংশ উদ্বাস্তু রেল লাইনের পাশে, খালের পাড়ে, ময়লা আবর্জনার পাশে ঝুপড়ি বেঁধে সীমাহীন দুর্ভোগ নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তারা আজও নাগরিকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত। অধিকাংশের রেশন কার্ড, ভোটার তালিকায় নাম, জবকার্ড, বি.পি.এল কার্ড নেই। রাজনৈতিক দলের বদান্যতায় যাদের নাম ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছে তাদেরও অধিকাংশের নাম রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে বাদ যাচ্ছে।

আজ যারা স্বাধীনতার সুখ ভোগ করছেন, তাদের এই মানুষগুলোর দায় গ্রহণ করতে হবে-এর কোনো বিকল্প নেই। নতুন প্রজন্ম জানতে চাইছে, দেশে এত ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ থাকতে সেদিন কেন ধর্মের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক দেশ ভাগকে তারা মেনে নিয়েছিলেন। মুসলিমলীগের 'পাকিস্তানের দাবি মানতে হবে তাতেই ভারত স্বাধীন হবে' এই শ্লোগানের প্রবক্তারা আজ এই অসহায় মানুষগুলোর হয়ে কথা বলছেন না কেন?

স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে, ইংরেজদের সহযোগিতা করে তারা পুরস্কার পেল পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশ। আর ফাঁসিতে, গুলিতে প্রাণ দিয়ে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুরা হলো বাস্তুচ্যুত, শরণার্থী, রিফিউজী। মাতৃভূমি থেকে তাদের পালিয়ে আসতে হলো ভারতে। যারা অসমে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের পরিচয় হলো বহিরাগত। যারা বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) থেকে গেলেন তাদের নামকরণ হলো জিম্মি, মালায়ুন, কাফের। আর যারা ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের পরিচয় হলো অনুপজাতি। এমন নির্মম স্বপ্নভঙ্গ কোনো দেশে কোনো কালে ঘটেছিল কিনা সন্দেহ। ২০০৩ সালে ১৮ ডিসেম্বর নাগরিকত্ব আইন সংশোধনী বিলের মূল উদ্দেশ্য ছিল জঙ্গি, সন্ত্রাসবাদীদের আটকানো। সেই আইনের ফাঁদে এই অসহায় উদ্বাস্তুদের পিষে মারা হচ্ছে। ১৯৪৬ সালে 14 Foreigner's Act, বৃটিশের তৈরি আইন যার দ্বারা দেশদ্রোহী গুপ্তচরদের গ্রেপ্তার করা হয়, বিদেশীদের আটক করা হয়। সেই আইনের বলে কেন এই অসহায় মানুষগুলোকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে? হাজতবাস থেকে শুরু করে জেল জরিমানা এবং দেশ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হচ্ছে। যারা বৃটিশের দালালী করেছে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে বৃটিশ বাহিনীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে, তারাও এই স্বাধীন ভারতে বৈধ নাগরিকের মর্যাদা নিয়ে বসবাস করছে। অথচ যাদের অফুরন্ত ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা লাভ হয়েছে তারা স্বাধীন ভারতে অবাঞ্ছিত।

এই মানুষগুলোর প্রতি রাষ্ট্রীয় সহানুভূতি, সাহায্য প্রদান ও তাদের নাগরিকত্ব প্রদান না করা হলে, মানবিকতার জন্য অশুভ পরিণতির সৃষ্টি হতে পারে। দেশের রাজনৈতিক নেতা, গণতান্ত্রিক দেশ প্রেমিক, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের এই কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

বিশ্বরত্ন ধ্যানচাঁদ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

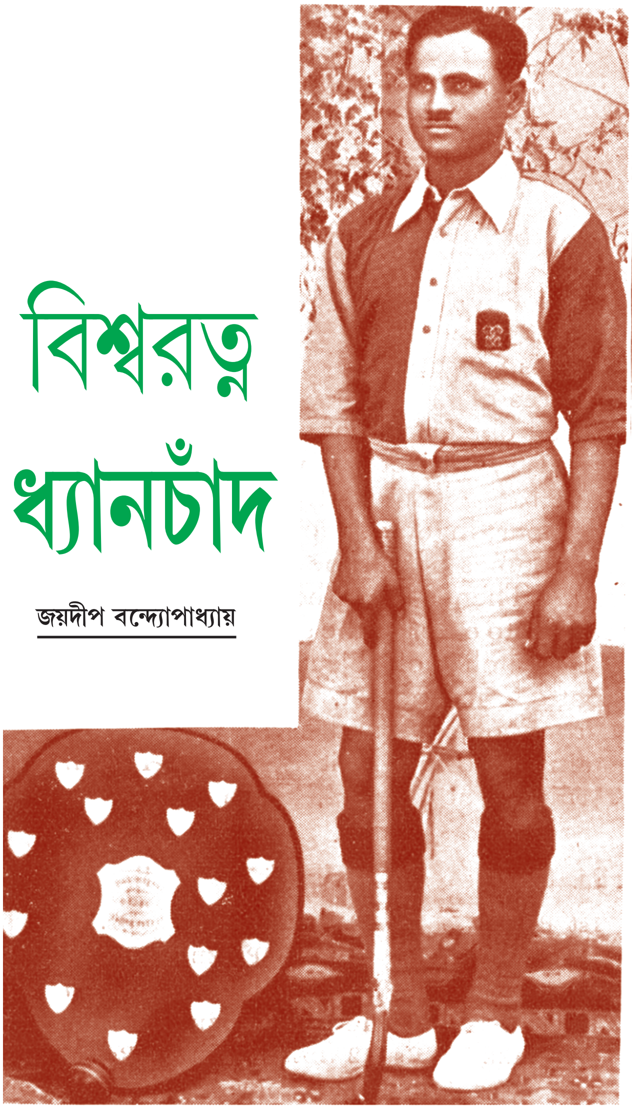

বিশ্ব অলিম্পিকে ভারতের সবথেকে বড় রাষ্ট্রদূত বা আর একটু বাড়িয়ে বললে 'আইকনিক' ব্যক্তিত্ব যে ধ্যানচাঁদ তাঁকে কি ভারতবাসী যথাযথ সম্মান, মর্যাদা দেখাতে পেরেছে? যে ধ্যানচাঁদকে নিয়ে বিশ্বের উন্নত হকি খেলিয়ে দেশের মানুষ এখনও চরম নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত, সেই রোম্যান্টিক অভিব্যক্তির প্রকাশে কেন এত অনীহা এদেশের মানুষের? ২৯ আগস্ট তাঁর জন্মদিনটি অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রক, সাই, হকি ইন্ডিয়া ও বেসরকারি ক্রীড়া সংগঠন ক্রীড়াভারতী নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করছে। কিন্তু তার সঙ্গে বৃহত্তর ভারতের সমাজ মানসের যোগসূত্র কতটুকু রয়েছে? বলিউডি তারকা বা কিংবদন্তী ক্রিকেটারদের নিয়ে যে উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনা দেখা যায়, তার সঙ্গে ধ্যানচাঁদের জন্মদিন বা তাকে নিয়ে চর্চার পরিসর কি তুল্যমূল্য মূল্যায়নে আসতে পারে? 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে'— এই আপ্তবাক্যটি যেন ধ্যানচাঁদের জীবনে প্রতিটি ছত্রের সঙ্গে মিলে যায়। গোটা বিশ্বে ধ্যানচাঁদ যে সম্মান, মর্যাদা, স্বীকৃতি পেয়েছেন, তা আলোচনা করতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। চারটি বিশ্ব অলিম্পিকে ভারতকে বিজয়মঞ্চে তোলা ধ্যানচাঁদকে অলিম্পিকের ইতিহাসে সর্বোত্তম অ্যাথলিটদের মধ্যে পাঁচ নম্বর স্থানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশ্ব সংস্থা ইউনেস্কো তাঁকে শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ ও ভারতের জাতীয় ক্রীড়া আন্দোলনের চালিকাশক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আর ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে তাঁর নামে হকি স্টেডিয়াম, রাস্তার নামকরণ এবং পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

যে ব্যাপারটা হয়ত কেউই জানেন না বা জানতেও চান না তা এই নিবন্ধে অবতারণা করা বিশেষ আবশ্যক। বৃটিশ শাসিত পরাধীন ভারতে সমস্ত শ্রেণীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছেই ধ্যানচাঁদ ছিলেন জীবনের চেয়েও বড় এক রূপকল্প। অনেক সভা-সমিতিতে গান্ধীজী পর্যন্ত ধ্যানচাঁদকে ডেকে নিয়ে গেছেন ও বিদেশের মাঠে তাঁর ও ভারতীয় দলের নান্দনিক ও বীরত্বব্যঞ্জক হকি শৈলীর কথা বলে উদ্দীপ্ত করেছেন তাঁর যোদ্ধাদের। বীর সাভারকর তাঁর বড় ভক্ত ছিলেন! কেউ কি জানেন যে চার্লি চ্যাপলিনকে নিয়ে সারা বিশ্ব পাগল সেই চ্যাপলিন তাঁর কত বড় ভক্ত ছিলেন। ১৯৩২-এর লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকের পর বিজয়ী ভারতীয় দলকে নিয়ে উন্মাদনা চরমে পৌঁছয় আমেরিকায়। অনেকটা স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে জনসম্মোহনী বক্তৃতার পর যা হয়েছিল প্রায় সেরকম আর কী। তা হলিউডের তারকাকুলও সে উন্মাদনায় সামিল হয়ে পড়েছিল।

চার্লি চ্যাপলিন, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস, ক্লার্ক গেবল, ভিভিয়ানলের মতো অভিনেতা, অভিনেত্রী ও অন্যান্য কলা কুশলী ভারতীয় দলের ম্যানেজার পঙ্কজ গুপ্তকে ধরলেন ও অনুনয় বিনয় করিয়ে রাজি করলেন তাদের সঙ্গে ভারতীয় দলের প্রীতিম্যাচ খেলার জন্য। খেলা উপলক্ষ্য, মূললক্ষ্য ধ্যানচাঁদ, রূপসিংহ, দারার মতো থ্রিমাস্কেটিয়ার্সের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। খেলার পর সিনেমা তারকারা ধ্যানচাঁদের সঙ্গে জার্সি বিনিময় পর্যন্ত করেছিলেন। আর সেই জার্সির মর্যাদা সারা জীবন রক্ষা করে গেছেন চ্যাপলিন, ফেয়ারব্যাঙ্কস-সহ সব হলিউড তারকাই। একই কথা প্রযোজ্য ক্রিকেট কিংবদন্তী ডন ব্রাডম্যান সম্পর্কেও। ১৯৩৫-এ অস্ট্রেলিয়া সফররত ভারতীয় হকি দলের মধ্যমণি ধ্যানচাঁদের সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেক মাইল পথ গাড়ি চালিয়ে চলে এসেছিলেন ব্রাডম্যান। এডিলেডে লর্ড মেয়রের পার্টিতে ধ্যানচাঁদের সঙ্গে আলাপ করে তার অটোগ্রাফ নিয়েছেন পর্যন্ত। ১৯৪৮-এর লন্ডন অলিম্পিকে ধ্যানচাঁদ ভারতীয় দলের পরামর্শদাতা হয়ে গেছিলেন। ভারত গ্রেটবৃটেনকে ফাইনালে হারিয়ে যথারীতি চাম্পিয়ন হয়েছিল। খেলার দুদিন পর ভারতীয় দলের সঙ্গে অবশিষ্ট বিশ্বদলের একটা প্রদর্শনী ম্যাচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল স্বয়ং রানী এলিজাবেথের ইচ্ছেয়। একমাত্র কারণ ছিল ধ্যানচাঁদের স্বর্গীয় হকি শিল্প প্রত্যক্ষ করা। রানীর অনুরোধে ধ্যানচাঁদ অত বছর বয়সেও মাঠে নেমেছিলেন এবং অনেক কম বয়সীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যাদুকরী প্রতিভার বিচ্ছুরণে রাজপরিবারের সব সদস্যের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। খেলার পর সমস্ত প্রোটোকল ভেঙে রানী এলিজাবেথ রয়্যালবক্স থেকে নেমে আসেন মাঠে। উদ্দেশ্য ধ্যানচাঁদের স্টিক পরীক্ষা করে দেখা তাতে কোনো বা দুটোনা আছে কিনা পরীক্ষা করতে। এরকম অজস্র ঘটনা ছড়িয়ে আছে ধ্যানচাঁদের ভুবনমোহিনী শিল্পদ্যুতিকে ঘিরে। বিদেশি সংবাদমাধ্যম তাঁকে 'অ্যাঞ্জেল' বলে অভিহিত করেছিল। আর বি বি সি তো ধ্যানচাঁদকে অলিম্পিক রত্ন হিসেবে তাদের আর্কাইভে স্থান দিয়েছে। ▮

শব্দরূপ-৭৬১ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

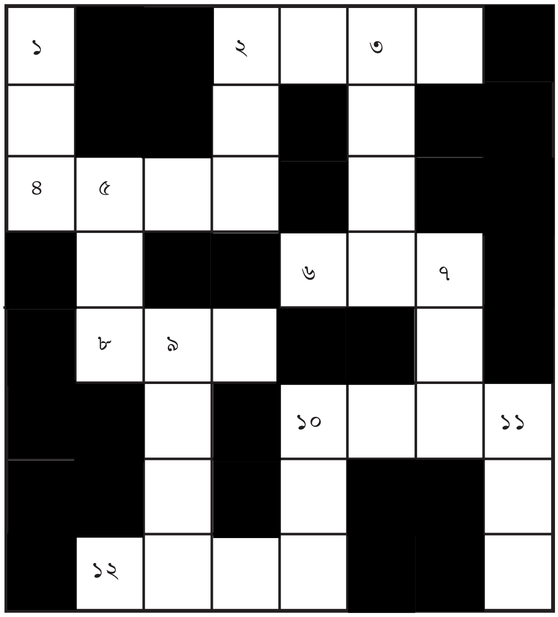

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, অপমৃত্যু, **৪.** ঋষি বিশেষ, ব্যাসের পিতা, **৬.** আমি, আমিত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন সত্তা, অহঙ্কার, **৮.** বিষ্ণু, **১০.** ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত জবালার পুত্র, **১২.** ঘোসাঘর, প্রাচীনকালে ক্রুদ্ধা নারীর আশ্রয়ের জন্য গৃহ।

উপর-নীচ : ১. বৃক্ষ, **২.** সরল; কৃষ্ণের পিতৃব্য, **৩.** যাহা বিটিলে সহজে ভাঙে না, **৫.** কনৌজরাজ হর্ষবর্ধনের ভগিনী, **৭.** বেলফুল, **৯.** নির্ধারিত, **১০.** এতে নাকি মেওয়া ফলে, **১১.** মাঝের আঙুল।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৫৮
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬

	পা	থ	রে	পাঁ	চ	কি	ল
সা	না	ই			র		
ক			হ	রি	ম	ট	র
চী	ব	র		ঠা		ক্ক	
	ক		বো		আ	র	শ
হ	রি	চ	র	ণ			স্ব
		র			ঠে	কা	র
দী	প	ক	অ	ধি	কা	রী	

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৭৬১ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ২

অধ্যাত্ম ও বিজ্ঞানকে আলাদা রাখা মানবতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অপরাধ : আম্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অমৃতা ইউনিভারসিটির কুলপতি হিসেবে আধ্যাত্মিক সন্ত মাতা অমৃতানন্দময়ী 'আম্মা' গত ১১ জুলাই নিউইয়র্কে আয়োজিত সম্মেলনে ৯৩টি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা স্কলারদের সামনে বক্তব্যে বলেন, অধ্যাত্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে ব্যবধান দূর করতে হবে। কেননা এই ব্যবধান সমাজের বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকারক। তিনি বলেন, বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মকে আলাদা রাখা মানবতার পক্ষে সবচেয়ে বড় অপরাধ। সম্মেলন অমৃতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউ এ এন আকাডেমিক-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের শীর্ষ শিক্ষা সংস্থান— স্ট্যানফোর্ড, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, মোনাসা এবং ন্যাশনাল ইউনিভারসিটি অব সিঙ্গাপুরের স্কলারদের দ্বারা সম্মেলনে গবেষণাপত্র পঠিত হয়।

সংস্কৃত বিজ্ঞানের উপযোগী ভাষা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সংস্কৃত সমস্ত ভাষার জননী বলে উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। গত ২৩ আগস্ট লক্ষ্ণৌ-এ রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান্ম এবং সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের পক্ষ থেকে তিনদিন ব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। সভায় তিনি বলেন, সংস্কৃত ভাষার মধ্যেই কলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য সমস্তই অন্তর্নিহিত রয়েছে। পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন কারিগরি বিদ্যার দিকও লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া তিনি আরো জানান, সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংস্কৃতের যে 'মহাঅভিযান' চালানো হচ্ছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তবে এসব কথার মধ্যেই আক্ষেপের সুর শোনা যায় তাঁর গলায়। তিনি বলেন, নাসা-র মতো জায়গায় যেখানে সংস্কৃতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেখানে আমাদের দেশ থেকেই এই প্রাচীন ভাষা হারিয়ে যেতে বসেছে। নাসা স্বীকার করেছে সংস্কৃত বিজ্ঞানের উপযোগী ভাষা। তবে তা হতে দিলে চলবে না। কারণ সংস্কৃত ভাষা কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করে না। এক একটি অঞ্চলের একএকরকম ভাষা বা ইংরাজি ভাষা উচ্চারণে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু সংস্কৃতের পক্ষে তা কখনই হয় না। বর্তমানে ইউ এস, ইউকে সাদরে সংস্কৃতকে বরণ করে নিয়েছে। তেমনি আমাদেরও এই ভাষাকে কাজে লাগিয়ে আরও এগিয়ে যেতে হবে। উত্তরপ্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে পাঠ্যসূচির মধ্যে সংস্কৃতের প্রতি যে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে তাও উল্লেখ করেন তিনি।

রামজন্মভূমি পরিসরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য অর্থ মঞ্জুর করছে অখিলেশ সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অযোধ্যায় রামজন্মভূমি পরিসরের সুযোগ-সুবিধার উন্নতি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এক বিস্তৃত পরিকল্পনা করেছে উত্তরপ্রদেশের অখিলেশ যাদব সরকার। এতে মুসলমানদের বিশেষত যারা মামলা করেছেন তাদের অত্যন্ত গোসা হয়েছে। তাদের বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্ট এই মামলায় যে স্থিতাবস্থার আদেশ দিয়েছে এর ফলে তা লঙ্ঘিত হবে এবং সেইসঙ্গে মুসলমানদের মনে আঘাত দেওয়া হবে।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ সরকার ওই পরিসরের ব্যারিকডগুলির পুনর্নির্মাণ, পরিকাঠামোগত উন্নতি এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কিছু অস্থায়ী নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রায় ১ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। গত ৮ জুলাই এই মর্মে সরকারের থেকে দুটি আলাদা বিজ্ঞপ্তি জারি করে পুলিশ বিভাগকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ সরকারের উচ্চপদস্থ এক আধিকারিক সরকারের এই প্রস্তাবিত সংস্কারের কথা স্বীকার করে জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিত স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হবে। উল্লেখ্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অস্থায়ী শ্রীরামমন্দিরে নতুন ত্রিপল মঞ্জুর হয়েছে। ২০১৬-র মার্চের মধ্যে এই প্রকল্পটির কাজ শেষ হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

'সামাজিক বিভাগ সানন্দে মেনে নিয়ে, ধীরে ধীরে ভারতীয় নারীগণ যতই অগ্রসর হবেন, ততই তাঁরা অধিক ধারণা করতে পারবেন, জাতি তাঁদের কাছে কী প্রত্যাশা করে এবং সেই গুণগুলিই বা কী, যার দ্বারা জাতীয় জীবন গঠিত হয়। দেশের সেই প্রত্যাশা স্বীকার করে নিয়ে জাতীয় গুণগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলে তাঁরা আগের চেয়ে আরও অনেক বেশি ভারতীয় ভাবে ভাবান্বিত হবেন এবং সেইসঙ্গে এমন উৎকর্ষ লাভ করবেন, অতীত যা কখনও চিন্তা করতে পারেনি।'

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
31 August - 2015 - Rs. 10.00

দাম : ১০.০০ টাকা